শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
ভৌতিক
গল্পসমগ্র

দুই পালোয়ান

পালোয়ান কিশোরী সিং-এর যে ভূতের ভয় আছে তা কাকপক্ষিতেও জানে না। কিশোরী সিং নিজেও যে খুব ভালো জানত এমন নয়।

আসলে কিশোরী ছেলেবেলা থেকেই বিখ্যাত লোক। সর্বদাই। চেলাচামুণ্ডারা তাকে ঘিরে থাকে। একা থাকার কোনও সুযোগই নেই তার। আর একথা কে না জানে যে একা না হলে ভূতেরা ঠিক সুবিধে করে উঠতে পারে না। জো পায় না।

সকালে উঠে কিশোরী তার সাকরেদ আর সঙ্গীদের নিয়ে হাজার খানেক বুকডন আর বৈঠক দেয়। তারপর দঙ্গলে নেমে পড়ে। কোস্তাকুস্তি করে বিস্তর ঘাম ঝরিয়ে দুপুরে একটু বিশ্রাম। বিকেলে প্রায়ই কারও না কারও সঙ্গে লড়াইতে নামতে হয়।

সন্ধের পর একটু গান-বাজনা শুনতে ভালোবাসে কিশোরী। রাতে সে পাথরের মতো পড়ে এক ঘুমে রাত কাবার করে। তখন তার গা-হাত-পা দাবিয়ে দেয় তার সাকরেদরা। এই নিশ্ছিদ্র রুটিনের মধ্যে ভূতেরা ঢোকবার কোনও ফাঁকই পায় না। গণপতি মাহাতো নামে আর একজন কুস্তিগীর আছে। সেও মস্ত পালোয়ান। দেশ-বিদেশের বিস্তর দৈত্য-দানবের মতো পালোয়ানকে সে কাত করেছে। কিন্তু পারেনি শুধু কিশোরী সিংকে। অথচ শুধু কিশোরী সিংকে হারাতে পারলেই সে সেরা পালোয়ানের খেতাবটা জিতে নিতে পারে।

কিন্তু মুশকিল হল নিতান্ত বাগে পেয়েও নিতান্ত কপালের ফেরে সে কিশোরীকে হারাতে পারেনি। সেবার লক্ষ্ণৌতে কিশোরীকে সে যখন চিত করে প্রায় পেড়ে ফেলেছে সেই সময়ে কোথা থেকে হতচ্ছাড়া এক মশা এসে তার নাকের মধ্যে ঢুকে এমন পন-পন করতে লাগল হাঁচি না দিয়ে আর উপায় রইল না তার। আর সেই ফাঁকে কিশোরী তার প্যাঁচ কেটে বেরিয়ে গেল। আর দ্বিতীয় হাঁচিটার সুযোগে তাকে রদ্দা মেরে চিত করে ফেলে দিল।

পাটনাতেও ঘটল আর এক কাণ্ড। সেবার কিশোরীকে বগলে চেপে খুব কায়দা করে স্ক্রু প্যাঁচ আঁটছিল গণপতি। কিশোরীর তখন দমসম অবস্থা। ঠিক সেই সময়ে একটা ষাঁড় খেপে গিয়ে দঙ্গলের মধ্যে ঢুকে লন্ডভন্ড কাণ্ড বাধিয়ে দিল। কিন্তু গণপতি দেখল এই সুযোগ হাতছাড়া হলে আর কিশোরীকে হারানো যাবে না। সুতরাং সে প্যাঁচটা টাইট রেখে কিশোরীকে ল্যাং মেরে ফেলে দেওয়ার ফিকির খুঁজছিল। সেই সময় ষাঁড়ের তাড়া খেয়ে দর্শকরা সব পালিয়েছে আর ষাঁড়টা আর কাউকে না পেয়ে দুই পালোয়ানের দিকে তেড়ে এল।

কিশোরী তখন বলল, 'গণপতি, ছেড়ে দাও। ষাঁড় বড় ভয়ঙ্কর জিনিস।

গণপতি বলল, ষাঁড় তো ষাঁড়, স্বয়ং শিব এলেও ছাড়ছি না।

ষাঁড়টা গুঁতোতে এলে গণপতি অন্য বগলে সেটাকে চেপে ধরল। সে যে কী সাংঘাতিক লড়াই হয়েছিল তা যে না দেখেছে সে বুঝবে না। দেখেছেও অনেকে। গাছের ডালে ঝুলে, পুকুরের জলে নেমে, বাড়ির ছাদে উঠে যারা আত্মরক্ষা করছিল তারা অনেকেই দেখেছে। গণপতি লড়াই করছে দুই মহাবিক্রম পালোয়ানের সঙ্গে —ষাঁড় এবং কিশোরী সিং। গাছের ডালে ঝুলে, পুকুরে ডুবে থেকেও সে লড়াই দেখে লোকে চেঁচিয়ে বাহবা দিচ্ছিল গণপতিকে।

ষাঁড়ের গুঁতো, কিশোরীর হুড়ো এই দুইকে সামাল দিতে গণপতি কিছু গন্ডগোল করে ফেলেছিল ঠিকই। আসলে কোন বগলে কে সেইটেই গুলিয়ে গিয়েছিল তার। হুড়যুদ্ধুর মধ্যে যখন সে এক বগলের আপদকে যুতসই একটা প্যাঁচ মেরে মাটিতে ফেলেছে তখনও তার ধারণা যে চিত হয়েছে কিশোরীই।

কিন্তু নসিব খারাপ। কিশোরী নয়, চিত হয়েছিল ষাঁড়টাই। আর সেই ফাঁকে কিশোরী তার ঘাড়ে উঠে লেংগউটি প্যাঁচ মেরে ফেলে দিয়ে জিতে গেল।

তৃতীয়বার তালতলার বিখ্যাত আখড়ায় কিশোরীর সঙ্গে ফের মোলাকাত হল। গণপতি রাগে-দুঃখে তখন দুনো হয়ে উঠেছে। সেই গণপতির সঙ্গে সুন্দরবনের বাঘ পর্যন্ত রণে ভঙ্গ দিয়ে লেজ গুটিয়ে পালাবে। তার হুংকারে তখন মেদিনী কম্পমান।

লড়াই যখন শুরু হল তখনই লোকে বুঝে গেল, আজকের লড়াইতে কিশোরীর কোনও আশাই নেই। কিশোরী তখন গণপতির নাগাল এড়িয়ে পালিয়ে বেড়াতে ব্যস্ত।

ঠিক এই সময়ে ঘটনাটা ঘটল। ভাদ্র মাস। তালতলার বিখ্যাত পাঁচসেরী সাতসেরী তাল ফলে আছে চারধারে। সেইসব চ্যাম্পিয়ন তালদের একজন সেই সময়ে বোঁটা ছিঁড়ে নেমে এল নিচে। আর পড়বি তো পড় সোজা গণপতির মাথার মধ্যিখানে।

গণপতির ভালো করে আর ঘটনাটা মনে নেই। তবে লোকে বলে, তালটা পড়ার পরই নাকি গণপতি কেমন স্তম্ভিতের মতো দাঁড়িয়ে গালে হাত দিয়ে কী যেন ভাবতে লাগল। সে যে লড়াই করছে, তার প্রতিদ্বন্দ্বী যে কিশোরী, এবং সতর্ক না হলে যে বিপদ তা আর তার মাথায় নেই তখন। সে নাকি গালে হাত দিয়ে হঠাৎ বিড়বিড় করে তুলসী দাসের রামচরিত মানস মুখস্থ বলে যাচ্ছিল। কিশোরী যখন সেই সুযোগে তাকে চিত করে তখনও সে নাকি কিছুমাত্র বাধা দেয়নি। হাতজোড় করে রামজীকে প্রণাম জানাচ্ছিল।

গণপতির বয়স হয়েছে। শরীরের আর সেই তাগদ নেই। কিশোরী সিংকে হারিয়ে যে খেতাবটা সে জিততে পারল না এসব কথাই সে সারাক্ষণ ভাবে।

ভাবতে-ভাবতে কী হল কে জানে। একদিন আর গণপতিকে দেখা গেল না।

ওদিকে কিশোরীর এখন ভারী নামডাক। বড়-বড় ওস্তাদকে হারিয়ে সে মেলা কাপ-মেডেল পায়। লোকে বলে, কিশোরীর মতো পালোয়ান দুনিয়ায় দ্বিতীয়টি নেই।

তা একদিন ডাকে কিশোরীর নামে একটা পোস্টকার্ড এল। গণপতির আঁকাবাঁকা হস্তাক্ষরে লেখা, 'ভাই কিশোরী, তোমাকে হারাতে পারিনি জীবনে এই আমার সবচেয়ে বড় দুঃখ। একবার মশা একবার ষাঁড়, আর একবার তাল আমার সাধে বাদ সেধেছে। তবু তোমার সঙ্গে আর একবার লড়বার বড় সাধ। তবে লোকজনের সামনে নয়। আমরা দুই পালোয়ান নির্জনে পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করব। আমি হারলে তোমাকে গুরু বলে মেনে নেব। তুমি হারলে আমাকে গুরু বলে মেনে নেবে। কে হারল, কে জিতল তা বাইরের কেউ জানবে না। জানব শুধু আমি, আর জানবে তুমি। যদি রাজি থাকো তবে আগামী অমাবস্যায় খেতুপুরের শ্মশানের ধারে ফাঁকা মাঠটায় বিকেলবেলায় চলে এসো। আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব।

চিঠিটা পড়ে কিশোরী একটু ভাবিত হল। সত্যি বটে, গণপতি খুব বড় পালোয়ান। এবং কপালের জোরেই তিন-তিনবার কিশোরীর কাছে জিততে-জিততেও হেরে গেছে। অতবড় একটা পালোয়ানের এই সামান্য আবদারটুকু রাখতে কোনও দোষ নেই। হারলেও কিশোরীর ক্ষতি নেই। সাক্ষীসাবুদ তো থাকবে না। কিন্তু হারার প্রশ্নও ওঠে না। কিশোরী এখন অনেক পরিণত, অনেক অভিজ্ঞ। তাছাড়া গণপতিকে

যে সে খুব ভালোভাবে হারাতে পারেনি সেই লজ্জাটাও তার আছে। সুতরাং লজ্জাটা দূর করার এই-ই সুযোগ। এবার গণপতিকে নায্যমতো হারিয়ে সে মনের খচখচানি থেকে মুক্ত হবে।

নির্দিষ্ট দিনে কিশোরী তৈরি হয়ে খেতুপুরের দিকে রওনা হল। জায়গাটা বেশি দূরেও নয়। তিন পোয়া পথ। নিরিবিলি জায়গা।

শ্মশানের ধারে মাঠটায় গণপতি অপেক্ষা করছিল কিশোরীকে দেখে খুশি হয়ে বলল, 'এসেছ। তাহলে লড়াইটা হয়ে যাক।'

কিশোরীও গোঁফ চুমড়ে বলল, 'হোক।'

দুজনে ল্যাঙট এঁটে, গায়ে মাটি থাবড়ে নিয়ে তৈরি হল।

তারপর দুই পালোয়ান তেড়ে এল দুদিক থেকে। কিশোরী ঠিক করেছিল, পয়লা চোটেই গণপতিকে মাটি থেকে শূন্যে তুলে ধোবিপাট মেরে কেল্লা ফতে করে দেবে।

কিন্তু সপাটে ধরার মুহূর্তেই হঠাৎ পোঁ করে একটা মশা এসে নাকে ঢুকে বিপত্তি বাধালো। হ্যাচ্চো-হ্যাচ্চো হাঁচিতে গগন কেঁপে উঠল। আর কিশোরী দেখল, কে যেন তাকে শূন্যে তুলে মাটিতে ফেলে চিত করে দিল।

গণপতি বলল, 'আর একবার।'

কিশোরী লাফিয়ে উঠে বলল, 'আলবাত।'

দ্বিতীয় দফায় যা হওয়ার তাই হল। লড়াই লাগতে না লাগতেই একটা ষাঁড় কোথা থেকে এসে যে কিশোরীর বগলে ঢুকল তা কে বলবে। কিশোরী আবার চিত।

গণপতি বলল, 'আর একবার হবে?'

কিশোরী বলল, 'নিশ্চয়ই।'

কী হবে তা বলাই বাহুল্য। লড়াই লাগতে না লাগতেই দশাসই এক তাল এসে পড়ল কিশোরীর মাথায়। কিশোরী 'পাখি সব করে রব' আওড়াতে লাগল। এবং ফের চিত হল।

হতভম্বের মতো যখন কিশোরী উঠে দাঁড়াল তখন দেখল, গণপতিকে ঘিরে ধরে কারা যেন খুব উল্লাস করছে। কিন্তু তারা কেউই মানুষ নয়! কেমন যেন কালো-কালো, ঝুলকালির মতো রং, রোগা, তেঠেঙে লম্বা সব অদ্ভুত জীব।

'জীব? না কি অন্য কিছু?'

কিশোরী হাঁ করে দেখল, গণপতিও আস্তে-আস্তে শুকিয়ে, কালচে মেরে, লম্বা হয়ে ওদের মতোই হয়ে যেতে লাগল।

কিশোরী আর দাঁড়ায়নি, 'বাবা রে, মা রে' বলে চেঁচিয়ে দৌড়তে লেগেছে।

কিশোরী পালোয়ানের ভূতের ভয় আছে একথা এখনও লোকে জানে না বটে। কিন্তু কিশোরী নিজে খুব জানে। আর এই জানলে তোমরা।

কৃপণ

কদম্ববাবু মানুষটা যতটা না গরিব তার চেয়ে ঢের বেশি কৃপণ। তিনি চণ্ডীপাঠ করেন কিনা কে জানে, তবে জুতো সেলাই যে করেন সবাই জানে। আর করেন মুচির পয়সা বাঁচাতে। তবে আরও একটা কারণ আছে। একবার এক মুচি তাঁর জুতো সেলাই করতে নারাজ হয়ে বলেছিল, 'এটা তো জুতো নয়, জুতোর ভূত। ফেলে দিন গে।' বাস্তবিকই জুতো এত ছেঁড়া আর তাপ্পি মারা যে সেলাই করার আর জায়গাও ছিল না। কিন্তু কদম্ববাবু দমলেন না। একটা গুণছুঁচ আর খানিকটা সুতো জোগাড় করে নিজেই লেগে গেলেন সেলাই করতে।

জুতো সেলাই থেকেই তাঁর ঝোঁক গেল অন্যান্য দিকে। জুতো যদি পারা যায় তাহলে ছাতাই বা পারা যাবে না কেন? সুতরাং ছেঁড়া ভাঙা ছাতাটাও নিজেই সারাতে বসে গেলেন। এরপর ইলেকট্রিক মিস্ত্রির কাজ, ছুতোরের কাজ, ছুরি-কাঁচি ধার দেওয়া, শিল কাটানো, ফুটো কলসি ঝালাই করা, ছোটখাটো দর্জির কাজ সবই নিজে করতে লাগলেন। এর ফলে যে উনি বাড়ির লোকের কাছে খুব বাহবা পান তা মোটেই নয়। বরং তাঁর বউ আর ছেলেমেয়েরা তাঁর এই কৃপণতায় খুবই লজ্জায় থাকে। বাইরের লোকের কাছে তাদের মুখ দেখানো ভার হয়।

কিন্তু কদম্ববাবু নির্বিকার। পয়সা বাঁচানোর যতরকম পন্থা আছে সবই তাঁর মাথায় খেলে যায়। তাঁর বাড়িতে ঝি-চাকর নেই। জমাদার আসে না। নর্দমা পরিষ্কার থেকে বাসন মাজা সবই কদম্ববাবু, তাঁর বউ বা ছেলেমেয়েরাও করে নেয়।

ছোট ছেলে বায়না ধরল, ঘুড়ি লাটাই কিনে দিতে হবে। কদম্ববাবু একটুও না ঘাবড়ে বসে গেলেন ঘুড়ি বানাতে। পুরোনো খবরের কাগজ দিয়ে ঘুড়ি আর কৌটো ছ্যাঁদা করে তার মধ্যে একটা ডাণ্ডা গলিয়ে লাটাই হল। ঘুড়িটা উড়ল না বটে, কিন্তু কদম্ববাবুর পয়সা বেঁচে গেল।

এহেন কদম্ববাবু একদিন অফিস থেকে বাড়ি ফিরছেন। চার মাইল রাস্তা তিনি হেঁটেই যাতায়াত করেন। হাঁটতে-হাঁটতে হঠাৎ মাঝ রাস্তায় ঝেঁপে বৃষ্টি এল। সস্তা ফুটো ছাতায় জল আটকাল না। কদম্ববাবু ভিজে ভূত হয়ে যাচ্ছিলেন। তাড়াতাড়ি একটা পুরোনো বাড়ির রক-এ উঠে ঝুল বারান্দার তলায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টির ছাঁট থেকে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করতে লাগলেন।

হঠাৎ পিছনে প্রকাণ্ড দরজাটা খুলে গেল। একজন বুড়ো মতন লোক মুখ বাড়িয়ে একগাল হেসে বলল, 'এই যে শ্যামবাবু! এসে গেছেন তাহলে? আসুন, আসুন, ভিতরে আসুন।'

কদম্ববাবু তটস্থ হয়ে বললেন, আমি তো শ্যামবাবু নই।

না হলে বা শুনছে কে? কর্তাবাবু দাবার ছক সাজিয়ে বসে আছেন যে! দেরি হলে কুরুক্ষেত্তর করবেন। এই কি রঙ্গ-রসিকতার সময়? আসুন, আসুন।

কদম্ববাবু সভয়ে বললেন, 'আমি তো দাবা খেলতে জানি না।'

লোকটা আর সহ্য করতে পারল না। কদম্ববাবুর হাতটা ধরে দরজার মধ্যে টেনে নিয়ে বলল, 'আচ্ছা লোক যা হোক। আপনি রসিক লোক তা আমরা সবাই জানি। তা বলে সবসময়ে কি রসিকতা করতে হয়?'

ভেতরে ঢুকে কদম্ববাবুর চোখ ছানাবড়া হয়ে গিয়েছিল। এইসব পুরোনো বনেদি বাড়িতে তিনি কখনও ঢোকেননি। যেদিকে তাকান চোখ যেন ঝলসে যায়।

মার্বেল পাথরে বাঁধানো মেঝে থেকে শুরু করে ঝাড়বাতি অবধি সবই টাকার গন্ধ ছড়াচ্ছে।

তিনি যে শ্যামবাবু নন, তাঁকে যে ভুল লোক ভেবে এ বাড়িতে ঢোকানো হয়েছে এ কথাটা ভালো করে জোর দিয়ে বলার মতো অবস্থাও কদম্ববাবুর আর রইল না। তিনি চারদিকে চেয়ে মনে-মনে হিসেব করতে লাগলেন, এই মার্বেল পাথরের কত দাম, কত দাম ওই দেয়ালঘড়ির...ভেজা ছাতা থেকে জল ঝরে মেঝে ভিজে যাচ্ছিল। লোকটা হাত বাড়িয়ে ছাতাটা হাত থেকে একরকম কেড়ে নিয়ে বলল, 'এঃ শ্যামবাবু, এই ছেঁড়া-তাপ্পি দেওয়া ছাতা কোথা থেকে পেলেন? আপনার সেই দামি জাপানি ছাতাখানার কী হল?

কদম্ববাবু শুধু হতভম্বের মতো বললেন, 'জাপানি ছাতা?'

লোকটা হঠাৎ তাঁর পেটে একটা চিমটি কেটে বলল, 'আপনার মতো শৌখিন মানুষ ক'টা আছে বলুন।'

ছেঁড়া জুতোয় জল ঢুকে সপ-সপ করছিল। কদম্ববাবু জুতো জোড়া সন্তর্পণে ছেড়ে রাখলেন একধারে।

কিন্তু লোকটার চোখ এড়ানো গেল না। জুতো জোড়া দেখতে পেয়ে লোকটা আঁতকে উঠে বলল, 'সেই সোনালি সুতোর কাজ করা নাগরা জোড়া কোথায় গেল আপনার? তার বদলে এ কী?'

কদম্ববাবু কৃপণ বটে, কিন্তু তিনি নিজেও জানেন যে, তিনি কৃপণ। সাধারণ কৃপণেরা টেরই পায় না যে, তারা কৃপণ। তারা ভাবে যা তারা যে করছে সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কদম্ববাবু তাদের মতো নন। তাই লোকটার কথায় ভারী লজ্জা পেলেন তিনি। এমনকী তিনি যা শ্যামবাবু নন এ কথাটাও হঠাৎ ভুলে গিয়ে বলে ফেললেন, 'বর্ষাকাল বলে নাগরা জোড়া পরিনি।'

লোকটা একটু তাচ্ছিল্যের ভাব দেখিয়ে বলল, 'যার দেড়শো জোড়া জুতো সে আবার সামান্য নাগরার মায়া করবে এটা কি ভাবা যায়? শ্যামবাবু ছেঁড়া জুতো পরে বাবুর বাড়ি আসছেন, এ যে কলির শেষ হয়ে এল!'

কদম্ববাবু এ কথা শুনে সভয়ে আড়চোখে নিজের পোশাকটাও দেখে নিলেন। পরনে মিলের মোটা ধুতি, গায়ে একটা সস্তা ছিটের শার্ট। শ্যামবাবু নিশ্চয়ই এই পোশাক পরেন না। যেন তাঁর মনের কথাটি টের পেয়েই লোকটা হঠাৎ বলে উঠল, 'নাঃ আজ বোধহয় আপনি ছদ্মবেশ ধারণ করেই এসেছেন, শ্যামবাবু। তা ভালো। বড়লোকদেরও কি আর মাঝে-মাঝে গরিব সাজাতে ইচ্ছে যায় না। নইলে শ্যামবাবুর গায়ে তালি-মারা জামা, পরনে হেঁটে ধুতি হয় কী করে!'

কদম্ববাবু বিগলিত হয়ে হাসলেন। বললেন, 'ঠিক ধরেছেন বটে।'

হলঘরের পর দরদালান। আহা, দরদালানেরও কি শ্রী! দু-ধারে পাথরের সব মূর্তি, বিশাল-বিশাল অয়েল পেন্টিং, পায়ের নিচে নরম কার্পেট।

এসব জিনিস চর্মচক্ষে বড় একটা দেখেননি কদম্ববাবু। তা শুনেছেন। টাকার কতখানি অপচয় যে এতে হয়েছে তা ভেবে তাঁর মাথা ঘুরতে লাগল।

দু-ধারে সারি-সারি ঘর। দরজায় ব্রোকেড বা ওই জাতীয় জিনিসের পর্দা ঝুলছে। দেয়ালগিরি আর ঝাড়লণ্ঠনের ছড়াছড়ি। এক-একটা ঝাড়ের দাম যদি হাজার টাকা করেও হয় কমপক্ষে।...

নাঃ কদম্ববাবু আর ভাবতে পারলেন না।

লোকটা দরদালানের শেষে একটা চওড়া সিঁড়ি বেয়ে উঠতে-উঠতে বলল, 'কর্তাবাবুও আজ আপনাকে দেখে মজা পাবেন। যা একখান ছদ্মবেশ লাগিয়ে এসেছেন আজ!'

কদম্ববাবু হেঃ-হেঃ করে অপ্রতিভ হাসি হাসলেন।

সিঁড়ি যে এরকম বাহারি হয় তা কদম্ববাবুর কল্পনাতেও ছিল না। আগাগোড়া পাথরে বাঁধানো কার্পেটে মোড়া এ সিঁড়িতে পা রাখতেই তাঁর লজ্জা করছিল।

দোতলায় উঠে কদম্ববাবু একেবারে বিমূঢ় হয়ে গেলেন। রাজদরবারের মতো বিশাল ঘর রুপোয় একেবারে রূপের হাট খুলে বসে আছে। যেদিকে তাকান সেদিকেই রূপো। রূপোর ফুলদানি, রূপোর ফুলের টব, রূপোর টেবিল, রূপোর চেয়ার, দেয়ালে রূপোর বাঁধানো বড়-বড় ফটো।

কদম্ববাবু চোখ পিটপিট করতে লাগলেন।

লোকটা একটু ফিচকে হেসে বলল, 'হল কী শ্যামবাবুর অ্যাঁ। এ বাড়ি আপনার অচেনা? রূপোমহলে দাঁড়িয়ে থাকলেই কি চলবে? কর্তাবাবু যে সোনামহল্লায় আপনার জন্য বসে থেকে থেকে হেদিয়ে পড়লেন। আসুন তাড়াতাড়ি।'

'সোনামহল্লা' কদম্ববাবুর বেশ ঘাম হতে লাগল শুনে। রুপো মহলেই যে লাখো-লাখো টাকা ছড়িয়ে আছে চারধারে।

কিংখাবের একটা পরদা সরিয়ে লোকটা বলল, যান, ঢুকে পড়ুন।

কদম্ববাবু কাঁপতে-কাঁপতে সোনামহল্লায় ঢুকলেন। কিন্তু ঢুকেই যে কেন মূর্ছা গেলেন না সেটাই অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন তিনি।

সোনামহল্লার সব কিছুই সোনার। এমনকী পায়ের তলার কার্পেটটায় অবধি সোনার সুতোর কাজ। সোনার পায়াওয়ালা টেবিল, সোনার পাতে মোড়া চেয়ার, সোনার ফুলদানি, সোনার ঝাড়লণ্ঠন। এত সোনা যে পৃথিবীতে আছে তা-ই জানা ছিল না কদম্ববাবুর।

তিনি এমন হাঁ হয়ে গেলেন যে, ঘরের মাঝে একটা বিরাট সোনার টেবিলের ওপাশে যে গৌরবর্ণ পুরুষটি একটা সোনায় বাঁধানো আরাম-কেদারায় বসে ছিলেন তাঁকে নজরেই পড়েনি তাঁর।

হঠাৎ একটা গমগমে গলা কানে এল, 'এই যে শ্যামকান্ত এসো।'

কদম্ববাবু ভীষণ চমকে উঠলেন।

চমকানোর আরও ছিল। কর্তাবাবুর সামনে যে দাবার ছকটি পাতা রয়েছে

সেটা যে শুধু সোনা দিয়ে তৈরি তা-ই নয়, প্রত্যেকটি খোপে আবার হিরে, মুক্তো, চুনী আর পান্না বসানো। একধারে সোনার ঘুঁটি, অন্যধারে রুপোর।

প্রত্যেকটি ঘুঁটির মাথায় আবার এক কুচি করে হিরে বসানো।

'বোসো, বোসো হে শ্যামকান্ত। আর সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না। মনে আছে তো আজ আমাদের বাজি রেখে খেলা। এই হল আমার বাজি।'

এই বলে কর্তাবাবু একটা নীল ভেলভেটে মোড়া বাক্সর ঢাকনা খুলে টেবিলের একপাশে রাখলেন।

কদম্ববাবু দেখলেন, বাক্সের মধ্যে মস্ত একটা মুক্তো। মুক্তো যে এত বড় হয় তা জানা ছিল না তাঁর।

'তুমি কি বাজি রাখবে শ্যামবাবু?'

কদম্ববাবু আমতা-আমতা করে বললেন, আমি গরিব মানুষ, কী আর বাজি রাখব বলুন।

কর্তাবাবু ঘর কাঁপিয়ে হাঃ-হাঃ অট্টহাসি হেসে বললেন, 'গরিবই বটে। বছরে যার কুড়ি লাখ টাকা আয় সে আবার কেমন গরিব?'

'আজ্ঞে আপনার তুলনায় আমি আর কী বলুন।'

কর্তাবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, 'সে কথাটা সত্যি শ্যামবাবু। আমার মেলা টাকা। এত টাকা যে আজকাল আমার টাকার ওপর ঘেন্না হয়। খুব ঘেন্না হয়।'

'টাকার ওপর ঘেন্না। কদম্ববাবুর মুখটা হাঁ-হাঁ করে উঠল।'

কর্তাবাবু গম্ভীর গলায় বললেন, 'আজ সকালে মনটা খারাপ ছিল। কিছুতেই ভালো হচ্ছিল না। কী করলুম জানো? দশ লক্ষ টাকার নোট আগুন জ্বেলে পুড়িয়ে দিলুম।'

'অ্যাঁ?'

'শুধু কি তাই? ছাদে উঠে মোহর ছুঁড়ে কাক তাড়ালুম। তাতে একটু মনটা ভালো হল। তারপর জুড়িগাড়ি করে হাওয়া খেতে বেরিয়ে এক হাজারটা হীরে আর মুক্তো রাস্তায় ছড়িয়ে দিয়ে এলুম।'

কদম্ববাবু দাঁতে দাঁত চেপে কোনওরকমে নিজেকে সামাল দিলেন। 'লোকটা বলে কী?'

কর্তাবাবু বললেন, 'এসো, চাল দাও। তুমি কী বাজি রাখবে বললে না?'

কদম্ববাবু মুখটা কাঁচুমাচু করে ভাবতে লাগলেন।

কর্তাবাবু নিজেই বললেন, 'টাকা-পয়সা হিরে-জহরত তো আমার দরকার নেই। তুমি বরং তোমার পকেটের ওই কলমটা বাজি ধরো।'

'কলম।' কদম্ববাবু শিউরে উঠলেন। মাত্র আট আনায় ফুটপাথ থেকে কেনা। তবু কদম্ববাবু উপায়ন্তর না পেয়ে কলমটাই রাখলেন মুক্তোর উলটোদিকে।

'কিন্তু চাল?' দাবার যে কিছুই জানেন না কদম্ববাবু।

চোখ বুজে একটা ঘুঁটি এগিয়ে দিলেন কদম্ববাবু।

কর্তাবাবু বললেন, 'সাবাস!'

কদম্ববাবু চোখ মেলে একটা শ্বাস ছাড়লেন। তারপর বুদ্ধি করে কর্তাবাবুর দেখাদেখি কয়েকটা চাল দিয়ে ফেললেন।

হঠাৎ কর্তাবাবু সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, এ কী! তুমি যে কিস্তি দিয়ে বসেছ আমাকে! অ্যাঁ! এ কী কাণ্ড! আমি যে মাত।

তারপরেই কর্তাবাবু হঠাৎ ঘর কাঁপিয়ে হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ করে অট্টহাসি হাসতে লাগলেন। সে এমন হাসি যে, কদম্ববাবুর মাথা ঝিম-ঝিম করতে লাগল। চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলেন। ভয়ে চোখও বুজে ফেললেন।

যখন চোখ মেললেন তখন কদম্ববাবু হাঁ।

কোথায় সোনার ঘর? কোথায় রুপোর ঘর? কোথায় সেই ঝাড়বাতি আর দেয়ালগিরি? কোথায় আসবাবপত্র? এ যে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার ভাঙা সোঁদা একটা পোড়ো বাড়ির মধ্যে বসে আছেন তিনি! চারদিকে চুন-বালি খসে ডাঁই হয়ে আছে। চতুর্দিকে মাকড়সার জাল। ইঁদুর দৌড়চ্ছে।

কদম্ববাবু আতঙ্কে একটা চিৎকার দিলেন। তারপর ছুটতে লাগলেন।

সেই বাড়িরই এমন দশা কে বিশ্বাস করবে? মেঝেয় পাথর সব উঠে গেছে, সিঁড়ি ভেঙে ঝুলে আছে, দরদালানের দেওয়াল ভেঙে পড়েছে।

কদম্ববাবু পড়ি কি মরি করে ধ্বংসস্তূপ পেরিয়ে কোনওরকমে বাইরের দরজায় পৌঁছলেন। দরজাটা অক্ষত আছে। কদম্ববাবু দরজাটার কড়া ধরে হ্যাঁচকা টান মারতে সেটি খুলে গেল।

কদম্ববাবু রাস্তায় নেমে ছুটতে লাগলেন। বৃষ্টি পড়ছে, তাঁর ছাতা নেই, পায়ে জুতোও নেই। ভাঙা পোড়ো বাড়ির মধ্যে কোথায় পড়ে আছে।

কদম্ববাবু হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন। তারপর ভাবতে লাগলেন সত্যিই তো টাকা বাঁচিয়ে হবেটা কী? শেষে তো ওই ভূতের বাড়ি।

বুক ফুলিয়ে কদম্ববাবু একটা দোকানে ঢুকে একটা বাহারি ছাতা কিনে ফেললেন। জুতোর দোকানে ঢুকে কিনলেন নতুন একজোড়া জুতো।

তারপর আবার ভাবতে লাগলেন। শুধু নিজের জন্যে কেনাকাটা করাটা ভালো দেখাচ্ছে না।

তিনি আবার দোকানে ঢুকে গিন্নির জন্য শাড়ি ও ছেলেমেয়েদের জন্য জামা-কাপড়ও কিনে ফেললেন।

মনটা বেশ ভালো হয়ে গেল তাঁর।

টেলিফোনে

'টেলিফোন তুললেই একটা গম্ভীর গলা শোনা যাচ্ছে, সিক্স ফোর নাইন ওয়ান... সিক্স ফোর নাইন ওয়ান...সিক্স ফোর নাইন ওয়ান...।'

সকাল থেকে ডায়াল-টোন নেই। টেলিফোনের হরেক গণ্ডগোল থাকে বটে, কিন্তু এ-অভিজ্ঞতা নতুন। গলাটা খুবই যান্ত্রিক এবং গম্ভীর। খুব উদাসীনও।

প্রদীপের কয়েকটা জরুরি টেলিফোন করার ছিল। করতে পারল না।

কিন্তু কথা হল, একটা অদ্ভুত কণ্ঠস্বর কেবল বারবার চারটে সংখ্যা উচ্চারণ করে যাচ্ছে কেন? এর কারণ কী? ঘড়ির সময় জানার জন্য বিশেষ নম্বর ডায়াল করলে একটা যান্ত্রিক কণ্ঠে সময়ের ঘোষণা শোনা যায় বটে, কিন্তু এ তো তা নয়। মিনিটে-মিনিটে সময়ের ঘোষণা বদলে যায়, কিন্তু এই ঘোষণা বদলাচ্ছে না।

অফিসে এসে সে তার স্টেনোগ্রাফারকে ডেকে টেলিফোনের ত্রুটিটা এক্সচেঞ্জে জানাতে বলেছিল। তারপর কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সে একটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির বড় অফিসার। বহু বছর দিল্লিতে ছিল, সম্প্রতি কলকাতায় বদলি হয়ে এসেছে। কোম্পানিই তাকে বাড়ি, গাড়ি ও টেলিফোন দিয়েছে। তাঁর আগে এই পদে

ছিলেন কুরুপ্পু নামে দক্ষিণ ভারতের একজন লোক। তিনি রিটায়ার করে দেশে ফিরে গিয়ে ফুলের চাষ করছেন বলে শুনেছে প্রদীপ। খুবই দক্ষ ও অভিজ্ঞ মানুষ ছিলেন তিনি। রিটায়ার করার বয়স হলেও কোম্পানি তাঁকে ছাড়তে চায়নি। বরং আরও বড় পোস্ট দিয়ে ধরে রাখতে চেয়েছিল। কুরুপ্পু কিছুতেই রাজি হননি।

দুপুরের লাঞ্চের আগে সে একটি পার্টিকে একটা বকেয়া বিলের জন্য তাগাদা করতে টেলিফোন তুলে ডায়ালের প্রথম নম্বরটার বোতাম টিপতেই আচমকা সেই উদাসীন, গম্ভীর, যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর শুনতে পেল, সিক্স ফোর নাইন, ওয়ান...তারপরই অবশ্য কণ্ঠস্বর থেমে গেল।

প্রদীপ খুবই অবাক হয়েছিল। সামলে নিয়ে বাকি নম্বর ডায়াল করতে রিং বাজল এবং ওপাশে একজন ফোনও ধরল। প্রয়োজনীয় কথা সেরে নিয়ে প্রদীপ খুব চিন্তিতভাবে অফিসের ইলেকট্রনিক টেলিফোনটার দিকে চেয়ে রইল। এই ফোনেও কণ্ঠস্বরটা এল কী করে? এসব হচ্ছে কী?

কলকাতার বাড়িতে প্রদীপের আত্মীয়স্বজন কেউ নেই। তার মা, বাবা বোন, ভাই সব দিল্লিতে। সে বিয়ে করেনি। একা থাকে, একজন রান্নার ঠিকে লোক রেঁধে দিয়ে যায়। আর ঘরদোর সাফ করা, বাসন মাজা ও কাপড় কাচার জন্য ঠিকে একজন কাজের মেয়ে আছে। তারা কেউ বাড়িতে থাকে না। আলিপুরের নির্জন অভিজাত পাড়ায় তিনতলার মস্ত ফ্ল্যাটে প্রদীপ সম্পূর্ণ একা। তবু প্রদীপ হঠাৎ ফ্ল্যাটের নম্বর ডায়াল করল এবং শুনতে পেল ওপাশে রিং হচ্ছে।

মাত্র তিনবার রিং বাজতেই কে যেন ফোনটা ওঠাল। কিন্তু কথা বলল না।

প্রদীপ বলল, 'হ্যালো। হ্যালো।'

কেউ জবাব দিল না। কিছুক্ষণ পর ফোনটা কেউ আস্তে নামিয়ে রাখল।

দুপুরবেলাতেও প্রদীপের শরীর হিম হয়ে এল। এসব হচ্ছেটা কী? যদি রং নম্বরই হয়ে থাকে তা হলেও তো ওপাশ থেকে কেউ না কেউ সাড়া দেবে।

বিকেলে পার্টি ছিল, ফ্ল্যাটে ফিরতে একটু রাতই হয়ে গেল। তার। আর ফেরার সময় মাথায় দুশ্চিন্তাটা দেখা দিল। সে অলৌকিকে বিশ্বাসী নয়, কিন্তু কোনও ব্যাখ্যাও তো পাওয়া যাচ্ছে না।

দরজা খুলে ফ্ল্যাটে ঢোকার পর একটু গা-ছমছম করছিল। তবে আলো জ্বেলে ঝলমলে আধুনিক ফ্ল্যাটটার দিকে চেয়ে তার ভয়-ভয় ভাবটা কেটে গেল। তবে ফোনটার ধারে-কাছে সে আর গেল না।

প্রদীপের গভীর ঘুম ভাঙল রাত দুটো নাগাদ। হলঘরে ফোন বাজছে। ঘুমচোখে সে তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে। দিল্লিতে মা-বাবার শরীর খারাপ হল না তো!

ফোন ধরতেই শিউরে উঠল সে। সেই যান্ত্রিক উদাসীন গম্ভীর গলা বলতে লাগল, 'সিক্স ফোর নাইন ওয়ান...সিক্স ফোর নাইন ওয়ান... সিক্স ফোর নাইন ওয়ান...।'

ফোনটা রেখে দিল সে। বাকি রাতটা আর ঘুম হল না। বিছানায় এপাশ-ওপাশ করে কাটিয়ে দিল।

কলকাতার টেলিফোন-ব্যবস্থা যে খুব খারাপ, তা প্রদীপ জানত। তবু সকালে ব্রেকফাস্টের সময় টেলিফোন বেজে উঠতেই প্রদীপ যখন কম্পিত বক্ষে গিয়ে টেলিফোন ধরল, তখন একটি অমায়িক কণ্ঠস্বর বলল, 'সার, আপনি টেলিফোন খারাপ বলে কমপ্লেন করেছিলেন কাল। কিন্তু আমরা টেস্ট করে দেখেছি আপনার লাইনে তো কোনও গন্ডগোল নেই। লাইন তো চালু আছে।'

'কিন্তু আমি যে টেলিফোনে একটা অদ্ভুত গলা শুনতে পাচ্ছি।'

'হয়তো ক্রস কানেকশান হয়ে গিয়েছিল। আমাদের যন্ত্রপাতি সব বহু পুরোনো, তাই মাঝে-মাঝে ওরকম হয়। আপনি ডায়াল করে দেখুন এখন, লাইন ঠিক আছে।'

বাস্তবিকই লোকটা কানেকশান কেটে দেওয়ার পর ডায়াল-টোন চলে এল এবং অফিসের নম্বর ডায়াল করতেই লাইনও পেয়ে গেল প্রদীপ।

ফোন স্বাভাবিক হল বটে, কিন্তু প্রদীপের মাথা থেকে 'সিক্স ফোর নাইন ওয়ান...' গেল না। কাজকর্মের ব্যস্ততার ফাঁকে-ফাঁকে নম্বরটা মনে পড়তে লাগল। এক-আধবার প্যাডে নম্বরটা লিখেও ফেলল।

বিকেলের দিকে কয়েকটা চিঠি সই করতে গিয়ে হঠাৎ চিঠির ওপরে টাইপ-করা তারিখটা দেখে সে একটু সচকিত হল। টু ফোর নাইন্টি ওয়ান। অর্থাৎ একানব্বই সালের দোসরা এপ্রিল। সিক্স ফোর নাইন ওয়ান মানে কি এপ্রিলের ছয় তারিখ?

কথাটা টিক-টিক করতে লাগল মাথার মধ্যে। অফিস থেকে বেরিয়ে সে গেল একটা ক্লাবে টেনিস খেলতে তারপর একটা হোটেলে রাতে খাবার খেয়ে ফ্ল্যাটে ফিরে এল। টেনিস খেলার ফলে ক্লান্ত শরীরে খুব ঘুম পাচ্ছিল। শোওয়ার আগে সে সভয়ে টেলিফোনটার দিকে চেয়ে রইল। দিল্লিতে ফোন করে মা-বাবার একটা খবর নেওয়া দরকার। ফোন করাটা উচিত হবে কি? যদি আবার...?

না, ফোন তুলে ডায়াল-টোনই পাওয়া গেল। দিল্লির লাইনও পাওয়া গেল একবারেই। মা, বাবা, ভাই ও বোনের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলে মনটা হালকা লাগল। আজ শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ল।

তিন-চারদিনই আর কোনও অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটল না। টেলিফোন স্বাভাবিক। দুশ্চিন্তা বা উদ্বেগটাও আস্তে-আস্তে সরে যেতে লাগল মন থেকে।

কিন্তু রবিবার সকালে গলফ খেলতে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিল প্রদীপ। হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠল। প্রদীপ অন্যমনস্কভাবে টেলিফোন তুলতেই সেই অবিস্মরণীয় যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'দিস ইজ দ্য ডে।'

'দিস ইজ দ্য ডে,...দিস ইজ দ্য ডে...দিস ইজ দ্য ডে...।'

সকালের আলোর মধ্যেও ভয়ে হঠাৎ হিম হয়ে গেল প্রদীপ। চিৎকার করে বলল, 'হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অব ইট?'

অবিচলিত কণ্ঠস্বর একইভাবে বলে যেতে লাগল, 'দিস ইজ দ্য ডে...দিস ইজ দ্য ডে...'

প্রদীপ চিৎকার করে ধমকাল, দু-একটা নির্দোষ গালাগালও দিল, কাকুতি-মিনতি করল। কিন্তু কণ্ঠস্বরের অধিকারী ওই একটা বাক্যই উচ্চারণ করে গেল।

এপ্রিলের কলকাতা এমনিতেই গরম। ফোনে চেঁচামেচির পর আরও ঘেমে উঠল সে। ফোনটা রেখে কিছুক্ষণ ঝিম মেরে বসে রইল। এর মানে কী?

হঠাৎ খেয়াল হল, আজ এপ্রিলের ছয় তারিখ। সিক্স ফোর নাইন ওয়ান। আজকের দিনটা সম্পর্কে কেউ তাকে কিছু বলতে চাইছে কি? কী বিশেষত্ব এই দিনটার?

আজ তো চমৎকার একটা দিন। আজ সারাদিন তাঁর দারুণ প্রোগ্রাম। তাদের অফিসের সবচেয়ে বড় ক্লায়েন্ট মাণ্টু সিং সরখেরিয়ার আমন্ত্রণে তারা আজ যাচ্ছে কলকাতার বাইরে দিল্লি হাইওয়ের কাছে সরখেরিয়ার বিশাল বাগানবাড়িতে। সকালে সেখানে গলফ আর টেনিসের আয়োজন, দুপুরে বিশাল লাঞ্চ, সন্ধেবেলায় হাই টি। তারপরও গানবাজনা হবে। একেবারে ডিনার সেরে ফেরার কথা। এমন চমৎকার মজায় ভরা দিনটা নিয়ে চিন্তা করার কী আছে?

ফুরফুরে হাওয়ায় হাওড়া ব্রিজ পেরিয়ে দিল্লি রোড হয়ে সরখেরিয়ার বাগানবাড়িতে পৌঁছনোর সময় দুশ্চিন্তাটা কখন উবে গেল। অনেক অতিথি জড়ো হয়েছে হাসি-হট্টগোল চলছে। গলফ কিট নিয়ে বেরিয়ে পড়ল প্রদীপ, এক কাপ কফি খেয়ে নিয়েই।

সরখেরিয়ার খামারের পাশেই গলফের বিশাল মাঠ। মাঝে-মধ্যে ঝোপ-জঙ্গল-জলা। অনেক গলফ-খেলোয়াড় জড়ো হয়েছেন। খেলতে-খেলতে সব দুশ্চিন্তা সরে গেল মাথা থেকে।

বলটা একটা ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে পড়েছিল। প্রদীপ বল খুঁজতে সেখানে ঢুকল। জায়গাটা যেন অন্ধকার এবং দুর্গম। কিন্তু জঙ্গলটা এমন জায়গায় যে, গর্ত পর্যন্ত যেতে হলে এই জঙ্গলটি পেরোতেই হবে।

সেই জঙ্গলে নিচু হয়ে বলটা খুঁজবার সময়ে আচমকাই একটা দূরাগত কণ্ঠ যান্ত্রিকভাবে হঠাৎ বলে উঠল, 'দিস ইজ দ্য ডে...'

একটা ক্লিক করে শব্দ হল কোথাও। সন্দেহজনক কিছু নয়। কিন্তু হঠাৎ প্রদীপের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ই যেন কিছু জানান দিল। সে বিদ্যুৎ-গতিতে মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। আর সঙ্গে-সঙ্গেই বজ্রপাতের মতো একটা বন্দুকের শব্দ হল। গাছের গোটা কয়েক ডাল প্রচণ্ড শক্তিশালী বুলেটের ঘায়ে ভেঙে পড়ল। তারপরই এক জোড়া পায়ের দ্রুত পালানোর শব্দ।

প্রদীপ যখন উঠে বসল তখন খানিকটা হতভম্ব হয়ে চারদিক দেখল সে। কেউ তাকে মারার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু খুবই সামান্যর জন্য সে বেঁচে গেছে।

উঠে গায়ের ধুলোটুলো ঝেড়ে চারদিকটা দেখল সে। কে তাকে মারতে চায়? কেনই বা?

বন্দুকের শব্দ শুনে কেউ ছুটে আসেনি। তার কারণ আশেপাশে অনেকেই শিকারে বেরিয়েছে। বন্দুকের শব্দ হচ্ছেও আশেপাশে।

সারাদিনটা খুব অন্যমনস্কতার মধ্যে কেটে গেল প্রদীপের। ঘটনাটার কথা সে কারও কাছে প্রকাশ করল না। রাতে বাড়ি ফিরে সে টেলিফোনটার দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ, টেলিফোনে এই দিনটার পূর্বাভাস দেওয়া হচ্ছিল তাকে। কিন্তু কেন? কে দিচ্ছিল?

রাত সাড়ে দশটা নাগাদ টেলিফোন বেজে উঠল।

সভয়ে টেলিফোন ধরল প্রদীপ।

'হ্যালো।'

ওপাশ থেকে একটি ভরাট গলা তার নম্বরটা উচ্চারণ করে ইংরেজিতে জিগ্যেস করল, 'এই নম্বর তো!'

'হ্যাঁ। আপনি কে?'

'আমি কুরুপ্পু। আপনি কে?'

'প্রদীপ রায়।'

'ওঃ, হ্যাঁ। আমি আপনার নাম জানি। দিল্লিতে ছিলেন। শুনুন, জরুরি একটা কথা আছে। সরখেরিয়ার এক কোটি চব্বিশ লাখ টাকার একটা বিল আছে। আপনি কি সেটা পাস করে দিয়েছেন?'

'না। বিলটা একটু ইরেগুলার। ক্ল্যারিফাই করার জন্য ডিপার্টমেন্টকে বলেছি।

'খুব ভালো। ওই বিলটা একদম জালি। কিন্তু বিলটা আটকালে আপনার বিপদ হতে পারে। সরখেরিয়া বিপজ্জনক লোক।'

'বোধহয় আপনি ঠিকই বলেছেন। আজ কেউ আমাকে খুন করার চেষ্টা করেছিল।'

'হ্যাঁ, এরকম ঘটনা আরও ঘটতে পারে। কিন্তু ভয় পাবেন না, টেলিফোনটার দিকে মনোযাগী থাকবেন।'

এইবার প্রদীপ চমকে উঠে বলে, 'হ্যাঁ, টেলিফোনেও একটা অদ্ভুত কাণ্ড হচ্ছে...'

কুরুপ্পু স্নিগ্ধ গলায় বললেন, 'জানি, মিস্টার রায়, ভূত মাত্রই কিন্তু খারাপ নয়। অন্তত ওই ফ্ল্যাটটায় যে থাকে সে খুবই বন্ধু-ভূত। তাকে অবহেলা বা উপেক্ষা করবেন না, ভয়ও পাবেন না। তা হলেই নিরাপদে থাকতে পারবেন। বিপদের আগেই সে সাবধান করে দেবে। আমাকেও দিত। তার পরামর্শেই আমি রিটায়ার করে ফুলের চাষে মন দিয়েছি। আচ্ছা গুড নাইট।'

প্রদীপ হাতের স্তব্ধ টেলিফোনটার দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল।

নিশি কবরেজ

হারানো একটা পুঁথিতে নিশি কবরেজ একটা ভারী জব্বর নিদান পেয়েছেন। গাঁটের ব্যথার যম। তবে মুশকিল হল পাচনটা তৈরি করতে যে পাঁচরকম জিনিস লাগে তার চারটে জোগাড় করা যায়। কিন্তু পাঁচ নম্বরটাই গোলমেলে। পাঁচ নম্বর জিনিসটা হচ্ছে আধ ছটাক ভুত।

নিশি কবরেজ রাতে খাওয়ার পর, দাওয়ায় দাঁড়িয়ে আচমন করছিলেন। ঘুটঘুটি অন্ধকার রাত্রি। চারদিক নিঃঝুম। শীতকালের কুয়াশা আর ঠান্ডাটাও জেঁকে পড়েছে। আঁচাতে-আঁচাতে নিশি কবরেজ পাচনটার কথাই ভাবছিলেন। রাজবল্লভবাবু বিরাট বড়লোক! কিন্তু গাঁটের ব্যথায় শয্যাশায়ী। ব্যথাটা আরাম করতে পারলে রাজবল্লভবাবু হাজার টাকা অবধি দিতে রাজি বলে নিজে মুখে কবুল করেছেন। কিন্তু ভূতটাই সব মাটি করলে। আধ ছটাক ভূত এখন পান কোথায়? হঠাৎ নিশি কবরেজের মনে হল, উঠোনের ওপাশটায় হাঁসের ঘরের পাশটায় কে যেন দাঁড়িয়ে আছে।

'কে রে? ওখানে কে?'

কেউ জবাব দিল না।

নিশি কবরেজ জলের ঘটিটা ঘরে রেখে হ্যারিকেন আর লাঠিগাছটা তুলে নিয়ে

বেরিয়ে এলেন। দিনকাল ভালো নয়। চোর-ছ্যাঁচড়ের দারুণ উপদ্রব। ঘরে কিছু কাঁচা টাকাও আছে। সোনাদানাও মন্দ নেই।

বাঁ-হাতে হ্যারিকেনটা তুলে ডানহাতে লাঠিটা নাচাতে-নাচাতে কয়েক পা এগোতেই উঠোনের ওপাশ থেকে একটু গলা খাঁকারির বিনয়ী শব্দ হল। চোরের তো গলা খাঁকারি দেওয়ার কথা নয়।

'কে রে? ওখানে কে?'

ওপাশ থেকে খোনাস্বরে জবাব এল। 'ইয়ে, আমি হলুম গে রামহরি—না, না থুড়ি, আমি হলুম ধনঞ্জয়।'

নিশি কবরেজ আলোটা ভালো করে তুলে ধরে লোকটাকে দেখার চেষ্টা করতে করতে বললেন, রামহরি বা ধনঞ্জয় নামে এ গাঁয়ে আবার কে আছে? কোথা থেকে আসা হচ্ছে শুনি। দরকারটাই বা কী? রুগি দেখতে হলে রাতে বিশেষ সুবিধে হবে না বলে রাখছি। দিনের বেলা এসো।

কে যেন বলে উঠল, 'আজ্ঞে ওসব কিছু নয়।'

নিশি কবরেজ লোকটাকে ঠিক ঠাহর করতে পারছেন না। তাঁর চোখের জোর কিছু কম নয়। হ্যারিকেনেও কালি পড়েনি। তবু ভালোমতো লোকটাকে দেখতে পাচ্ছেন না। শুধু বুঝতে পারছেন, হাঁসের ঘরের পাশে খুব কালো একটা লম্বাপানা ছায়া-ছায়া কী যেন।

নিশি কবরেজ মনে-মনে ভাবলেন, 'এঃ চোখের বোধহয় বারোটা বাজল এতদিনে। না, কাল থেকে চোখে তিনবেলা ত্রিফলার জল দিতে হবে।

নিশি কবরেজ বললেন, 'রুগির ব্যাপার নয় তো এত রাতে চাও কী? চোর-টোর নও তো বাপু?'

'আজ্ঞে না, চোর-ডাকাত হওয়ার উপায়ও নেই কি না। একটা সমস্যা নিয়ে আপনার কাছে এসেছিলুম আজ্ঞে।'

'সমস্যাটা কী?'

'আজ্ঞে বলে দিতে হবে যে আমি রামহরি, না ধনঞ্জয়।'

নিশি কবরেজ খ্যাঁক করে উঠে বললেন, 'ইয়ার্কি হচ্ছে? তুমি রামহরি না ধনঞ্জয় তা আমি কী করে বলব? আমি তোমাকে চিনিই না।'

'আজ্ঞে আপনি আমাদের চেনেন—থুড়ি—চিনতেন। আমরা দুজনেই গেলবার ওলাউঠায় মরলুম, মনে নেই? আপনার পাচন ফেল মারল।'

নিশি কবরেজ আঁতকে উঠে বললেন, 'তোমরা? ওরে বাবা।'

'আজ্ঞে ভয় খাবেন না। আমরা ভারী দুর্বল জিনিস।'

নিশি কবরেজ কাঁপতে-কাঁপতে বললেন, পাচনের দোষ নেই বাবা, সবই কপালের ফের। আমাকে তোমরা মাপ করো।

'আজ্ঞে সেজন্য আপনাকে আমি দুষতে আসিনি। ভয়ের কিছু নেই। কিন্তু সমস্যা

একটা দেখা দিয়েছে। ভূত হওয়ার পর আমরা সব কেমন যেন ধোঁয়াটা মার্কা হয়ে গেলুম। শরীর-টরীর নেই, তবে কী করে যেন আছি। তা আমরা অর্থাৎ আমি আর ধনঞ্জয়—মানে আমি আর রামহরি—মানে কে যে কোন জন তা বলা মুশকিল—তা আমরা দুজন খুব মাখামাখি করি। খুব বন্ধুত্ব ছিল তো দুজনে। এ ওর শরীরে ঢুকে যাই, ও এর শরীরে মিশে যায়। কিন্তু ওই মাখামাখি করতে গিয়েই কে যে কোনজন তা গুলিয়ে গেছে।'

'বলো কী? '

'আজ্ঞে সেই কথাটাই বলতে আসা। দুজনে প্রায়ই ঝগড়া লেগে যাচ্ছে। কখনও আমি বলি যে, আমি রামহরি, ও ধনঞ্জয়। কখনও বলে যে, ও রামহরি আর আমি ধনঞ্জয়।'

নিশি কবরেজ এই শীতেও ঘামছিলেন। হাতের হ্যারিকেন আর লাঠি দুই-ই ঠকঠক করে কাঁপছে। পেটের ভেতরে গুড়গুড় করছে। মাথা ঘুরছে। কিন্তু হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে গেল, গাঁটের ব্যাথার পাচনটার জন্য আধ ছটাক ভূত লাগবে।

নিশি কবরেজ একগাল হাসলেন। তাঁর হাত-পায়ের কাঁপুনি বন্ধ হল। গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, 'এ আর বেশি কথা কী? তবে এখন তোমার যেমন বেগুন পোড়ার মতো চেহারা হয়েছে তাতে তো কিছু বোঝবার উপায় নেই। একটু ধৌতি দরকার। বেশি কষ্ট হবে না। একটা পাচনের মধ্যে মিনিট দশেক সেদ্দ করে নেব তোমাকে, তাতেই আসল চেহারাটা বেরিয়ে আসবে।'

'বটে!' বলে কালো জিনিসটা এগিয়ে এল।

নিশি কবরেজ আর দেরি করলেন না। নিশুতরাতেই পাচনাটা উনুনে বসিয়ে কোমর বেঁধে লেগে গেলেন। ভূতটা সেদ্ধ হতে-হতে মাঝে-মাঝেই মাথা তুলে বলে, হল?

নিশি কবরেজ অমনি কাঠের হাতাটা দিয়ে সেটাকে ঠেসে দিতে-দিতে বলেন, হচ্ছে হে হচ্ছে। তাড়াহুড়ো করলে কী হয়? তোমার তো আর গায়ে ফোস্কা পড়ছে না হে!

পাচনটা ভোররাতে তৈরি হয়ে গেল। আর আশ্চর্যের বিষয় ভূতের ঝুলকালো রংটাও একটু ফ্যাকাসে মারল। নিশি কবরেজ খুব ভালো করে জিনিসটাকে নিরীক্ষণ করে বললেন, 'আরে, তুমি তো রামহরি।'

ভূতটা একথায় ভারী খুশি হয়ে বলল, 'আজ্ঞে বাঁচালেন, ধনঞ্জয়ের কাছে রামহরি শ'তিনেক টাকা পেত কিনা। ভারী দুশ্চিন্তা ছিল আমার। পেন্নাম হই আজ্ঞে। বলে ভূতটা হাওয়ায় মিশে গেল।'

নিশি কবরেজ পাচনাটা বোতলে পুরে নিশ্চিন্ত মনে তামাক খেতে বসলেন, বড্ড ধকল গেছে।

পুরোনো জিনিস

মদনবাবুর একটা নেশা, পুরোনো জিনিস কেনা। মদনবাবুর পৈতৃক বাড়িটা বিশাল, তাঁর টাকারও অভাব নেই, বিয়ে-টিয়ে করেননি বলে এই একটা বাতিক নিয়ে থাকেন। বয়স খুব বেশিও নয়, ত্রিশ পঁয়ত্রিশের মধ্যেই। তিনি ছাড়া বাড়িতে একটি পুরোনো রাঁধুনী বামুন আর বুড়ো চাকর আছে। মদনবাবু দিব্যি আছেন। ঝুট-ঝামেলা নেই, কোথাও পুরোনো জিনিস, কিম্ভুত জিনিস কিনে ঘরে ডাঁই করেছেন তার হিসেব নেই। তবে জিনিসগুলো ঝাড়পোঁচ করে সযত্নে রক্ষা করেন তিনি। ইঁদুর আরশোলা উঁইপোকার বাসা হতে দেন না। ট্যাক ঘড়ি, দেয়াল ঘড়ি, আলমারি, খাট-পালং ডেস্ক, টেবিল, চেয়ার, দোয়াতদানী, নস্যির ডিবে, কলম, ঝাড়লণ্ঠন, বাসনপত্র সবই তাঁর সংগ্রহে আছে।

খবরের কাগজে তিনি সবচেয়ে মন দিয়ে পড়েন পুরোনো জিনিস বিক্রির বিজ্ঞাপন, রোজ অবশ্য ওরকম বিজ্ঞাপন থাকে না। কিন্তু রবিবারের কাগজে একটি-দুটি থাকেই।

আজ রবিবার সকালে মদনবাবু খবরের কাগজ পড়তে-পড়তে এক জায়গায় এসে উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। ম্যাকফারলন সাহেবের দেড়শো বছরের পুরোনো বাড়ির সব জিনিস বিক্রি করা হবে।

ব্রড স্ট্রিটে ম্যাকফারলন সাহেবের যে বাড়িটা আজও টিকে আছে তার অবস্থা খুবই শোচনীয়। পড়ো-পড়ো অবস্থা। কর্পোরেশন থেকে বহুবার বাড়ি ভাঙার নোটিশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বুড়ো ম্যাকফারলনের আর সরবার জায়গা ছিল না বলে বাড়িটা ভাঙা হয়নি। ওই বাড়িতে ম্যাকফারলনদের তিন পুরুষের বাস। জন ম্যাকফারলনের সঙ্গে মদনবাবুর একটু চেনা ছিল, কারণ জন ম্যাকফারলনেরও পুরোনো জিনিস কেনার বাতিক ছিল। মাত্র মাস পাঁচেক আগে সাহেব মারা যান। তখনই মদনবাবু তাঁর জিনিসপত্র কিনে নেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু পারেননি। এক অবাঙালি ব্যবসায়ীর কাছে আগে থেকেই বাড়ি এবং জিনিসপত্র বাঁধা দেওয়া ছিল। সেই ব্যবসায়ী মদনবাবুকে সাফ বলে দিয়েছিল, 'উটকো ক্রেতাকে জিনিস বিক্রি করা হবে না। নিলামে চড়ানো হবে।'

মদনবাবু তাঁর বুড়ো চাকরকে ডেকে বললেন, 'ওরে ভজা, আমি চললুম। দোতলার হলঘরটার উত্তর দিক থেকে পিয়ানোটাকে সরিয়ে কোণে ঠেলে দিস, আজ কিছু নতুন জিনিস আসবে।'

ভজা মাথা নেড়ে বলে, 'নতুন নয় পুরোনো।'

'ওই হল। আর রাঁধুনীকে বলিস খাবার ঢাকা দিয়ে রাখে যেন। ফিরতে দেরি হতে পারে।'

মদনবাবু ট্যাক্সি হাঁকিয়ে যখন ম্যারফারলনের বাড়িতে পৌঁছলেন তখন সেখানে বেশ কিছু লোক জড়ো হয়ে গেছে। মদনবাবু বেশিরভাগ লোককেই চেনেন। এরা সকলেই পুরোনো জিনিসের সমঝদার এবং খদ্দের। সকলেরই বিলক্ষণ টাকা আছে। মদনবাবু বুঝলেন আজ তাঁর কপালে কষ্ট আছে। আদৌ কোনও জিনিস হাত দেওয়া যাবে কিনা সন্দেহ।

নিলামের আগে খদ্দেররা এঘর-ওঘর ঘুরে ম্যাকফারলনের বিপুল সংগ্রহরাশি দেখছেন। আসবাবপত্র থেকে শুরু করে ছোটখাটো জিনিসের এক খনি বিশেষ। কোনটা ছেড়ে কোনটা ধরেন তা ভাবতে গিয়ে মদনবাবু হিমসিম খেতে লাগলেন।

বেলা বারোটায় নিলাম শুরু হল। একটা করে জিনিস নিলামে ওঠে, আর সঙ্গে-সঙ্গে হাঁকডাক পড়ে যায়। মদনবাবুর চোখের সামনে একটা মেহগিনির পালঙ্ক দশহাজার টাকায় বিকিয়ে গেল। একটা কাট গ্লাসের পানপাত্রের সেট বিকিয়ে গেল বারো হাজার টাকায়। এছাড়া মুক্তোমালার দাম উঠল চল্লিশ হাজার।

মদনবাবু বেলা চারটে অবধি একটা জিনিসও ধরতে পারলেন না। মনটা ভারী খারাপ হয়ে গেল। দর আজ যেন বড্ড বেশি উঠে যাচ্ছে।

একেবারে শেষদিকে একটা পুরোনো কাঠের আলমারি নিলামে উঠল, বেশ বড়সড় এবং সাদামাটা। আলমারিটা অন্তত একটা স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে কব্জা করার জন্য মদনবাবু প্রথমেই দর হাঁকলেন পাঁচ হাজার।

অমপি পাশ থেকে কে যেন ডেকে দিল, 'কুড়ি হাজার।'

মদনবাবু অবাক হয়ে গেলেন। একটা কাঠের আলমারির দর এত ওঠার কথাই না! কেউ ফাঁকা আওয়াজ ছেড়ে দর বাড়াচ্ছে নাকি? নিলামে এরকম প্রায়ই হয়।

তবে মদনবাবুর মর্যাদাতেও লাগছিল খালি হতে ফিরে যাওয়াটা। একটা কিছু না নিয়ে যেতে পারলে নিজের কাছেই যেন নিজে মুখ দেখাতে পারবে না, মদনবাবু তাই মরিয়া হয়ে ডাকলেন, 'একুশ হাজার।'

আশ্চর্য এই যে, দর আর উঠল না।

একুশ হাজার টাকায় আলমারিটা কিনে মহানন্দে বাড়ি ফিরলেন মদনবাবু। যদিও মনে-মনে বুঝলেন, দরটা বড্ড বেশি হয়ে গেল।

পরদিন সকালে আলমারিটা কুলিরা ধরাধরি করে পৌঁছে দিয়ে গেল। দোতলার হলঘরের উত্তরদিকের জানালার পাশেই সেটা রাখা হল। বেশ ভারি জিনিস। দশটা কুলি গলদঘর্ম হয়ে গেছে এটাকে তুলতে।

নিলামওয়ালার দেওয়া চাবি দিয়ে আলমারিটা খুলে ফেললেন মদনবাবু।

নিচে আর ওপরে কয়েকটা ড্রয়ার। মাঝখানে ওয়ার্ডরোভ। মদনবাবু অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে দেখলেন জিনিসটা, বর্মা-সেগুন কাঠের তৈরি ভালো জিনিস। কিন্তু একুশ হাজার টাকা দরটা বেজায় বেশি হয়ে গেছে। তার আর কী করা! এ নেশা যার আছে তাকে মাঝে-মাঝে ঠকতেই হয়।

একুশ হাজার টাকার কথা ভাবতে-ভাবতেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন মদনবাবু। গভীর রাতে ম্যাকফারলন সাহেবকে স্বপ্নে দেখলেন। বুড়ো তাঁকে বলছে, 'তুমি মোটেই ঠকোনি হে, বরং জিতেছ।'

মদনবাবু ম্লান হেসে বললেন, না সাহেব, নিছক কাঠের আলমারির জন্য দর হাঁকাটা আমার ঠিক হয়নি।

ম্যাকফারলন শুধু ঘন-ঘন মাথা নেড়ে বলল, 'না-না আমার তা মনে হয় না!'

'আমার তা মনে হয় না...'

মদনবাবু মাঝরাতে ঘুম থেকে উঠে একবার জল খান রোজই। আজ ঘুম ভাঙল। পাশের টেবিল থেকে জলের গেলাসটা নিতে গিয়ে হঠাৎ শুনলেন, পাশের হলঘর থেকে যেন একটু খুটুর-খুটুর শব্দ আসছে। ওই ঘরে তাঁর সব সাধের পুরোনো জিনিস। মদনবাবু তাড়াতাড়ি উঠে টর্চ নিয়ে পাশের ঘরে হানা দিলেন।

টর্চটা জ্বালাতে যাবেন এমন সময় কে যেন বলে উঠল, 'দয়া করে বাতি জ্বালাবে না, আমার অসুবিধে হবে।'

মদনবাবু ভারী রেগে গেলেন, টর্চের সুইচ টিপে বললেন, 'আচ্ছা নির্লজ্জ লোক তো! চুরি করতে ঢুকে আবার চোখ রাঙানো হচ্ছে! কে হে তুমি?'

চোরটা যে কে বা কেমন লোক তা বোঝা গেল না। কারণ টর্চটা জ্বলল না। মদনবাবু টর্চটা বিস্তর ঝাঁকালেন, নাড়লেন, উলটে-পালটে সুইচ টিপলেন, বাতি জ্বলল না।

'এ তো মহা ফ্যাসাদ দেখছি!'

কে যেন মোলায়েম স্বরে বলল, 'অত ঘাবড়াচ্ছেন কেন?'

মদনবাবু চোরকে ধরার জন্য আস্তিন গোটাতে গিয়ে টের পেলেন যে, তাঁর গায়ে জামা নেই, আজ গরম বলে খালি গায়ে শুয়েছিলেন, হেঁড়ে গলায় একটা হাঁক মারলেন, 'শিগগির বেরও বলছি, নইলে গুলি করব। আমার কিন্তু রিভলভার আছে।'

'নেই।'

'কে বলল নেই?'

'জানি কি না।'

'কিন্তু লাঠি আছে।'

'খুঁজে পাবেন না।'

'কে বলল খুঁজে পাব না?'

'অন্ধকারে লাঠি খোঁজা কি সোজা?'

আমার গায়ে কিন্তু সাংঘাতিক জোর, এক ঘুঁষিতে নারকেল ফাটাতে পারি।

'কোনওদিন ফাটাননি।'

'কে বলল ফাটাইনি।'

'জানি কিনা। আপনার গায়ে তেমন জোরই নেই।'

'আমি লোক ডাকি, দাঁড়াও।'

'কেউ আসবে না। কিন্তু খামোকা কেন চেঁচাচ্ছেন?'

'চেঁচাব না? আমার এত সাধের সব জিনিস এ-ঘরে, আর এই ঘরেই কিনা চোর!'

'চোর বটে, কিন্তু এলেবেলে চোর নই মশাই।'

'তার মানে?'

কাল সকালে বুঝবেন। এখন যান গিয়ে ঘুমোন। আমাকে ডিস্টার্ব করবেন না।

মদনবাবু ফের ঘাবড়ে গিয়ে ফিরে এলেন ঘরে। দুরু-দুরু বুকে বসে থেকে পাশের ঘরের নানা বিচিত্র শব্দ শুনতে লাগলেন। তাঁর সাধের সব জিনিস বুঝি এবারে যায়।!

দিনের আলো ফুটতেই মদনবাবু গিয়ে হলঘরে ঢুকে যা দেখলেন তাতে ভারী অবাক হয়ে গেলেন। ম্যাকফারলনের সেই কাট গ্লাসের পানপাত্রের সেট আর একটা

গ্র্যান্ড ফাদার ক্লক হলঘরে দিব্যি সাজিয়ে রাখা। এ দুটো জিনিস কিনেছিল দুজন আলাদা খদ্দের। খুশি হবেন কি দুঃখিত হবেন তা বুঝতে পারলেন না মদনবাবু। কিন্তু অনেক ভেবেচিন্তে শেষে খুশি-খুশিই লাগছিল তাঁর।

আবার রাত হল। মদনবাবু খেয়েদেয়ে শয্যা নিলেন। তবে ঘুম হল না। এপাশ-ওপাশ করতে-করতে একটু তন্দ্রা মতো এল। হঠাৎ হলঘরে আগের রাতের মতো শব্দ শুনে তড়াক করে উঠে পড়লেন। হলঘরে গিয়ে ঢুকে টর্চটা জ্বালাতে চেষ্টা করলেন।

‘কে?’

‘তা দিয়ে আপনার কী দরকার? যান না গিয়ে শুয়ে থাকুন। আমাদের কাজ করতে দিন।’

মদনবাবু একটু কাঁপা গলায় বললেন, ‘তোমরা কারা বাবারা?’

‘সে কথা শুনলে আপনি ভয় পাবেন।’

‘ইয়ে তা আমি একটু ভীতু বটে। কিন্তু বাবারা, এসব কি হচ্ছে, একটু জানতে পারি না।’

‘খারাপ তো কিছু হয়নি মশাই। আপনার তো লাভই হচ্ছে।’

‘তা হচ্ছে, তবে কিনা চুরির দায়ে না পাড়ি। তোমরা কি চোর?’

লোকটা এবার রেগে গিয়ে বলল, ‘কাল থেকে চোর-চোর করে গলা শুকোচ্ছেন কেন? আমরা ফালতু চোর নই।’

‘তবে?’

‘আমরা ম্যাকফারলন সাহেবের সব চেলা-চামুণ্ডা। আমি হলুম গে সর্দার, যাকে আপনি কিনেছেন একুশ হাজার টাকায়।’

‘আলমারি?’

‘আজ্ঞে। আমরা সব ঠিক করেই রেখেছিলুম, যে খুশি আমাদের কিনুক না কেন আমরা শেষ অবধি সবাই মিলেমিশে থাকব, তাই—’

‘তাই কি?’

‘তাই সবাই জোট বাঁধছি, তাতে আখেরে আপনারই লাভ।’

মদনবাবু বেশ খুশিই হলেন। তবু মুখে একটু দুশ্চিন্তা প্রকাশ করে বললেন, ‘কিন্তু বাবারা, দেখো যেন চুরির দায়ে না পড়ি।’

‘মেলা ফ্যাচ-ফ্যাচ না করে, যান না নাকে তেল দিয়ে শুয়ে থাকুন গে। কাজ করতে দিন।’

মদনবাবু তাই করলেন। শুয়ে খুব ফিচিক-ফিচিক হাসতে লাগলেন, হলঘরটা ভরে যাবে, দোতলা-তিনতলায় যা ফাঁকা আছে তাও আর ফাঁকা থাকবে না। এবার চারতলাটা না তুললেই নয়।

দুই ভূত

লালু আর ভুলুর কোনও কাজ নেই। তারা সারাদিন গল্প করে কাটায়। সবই নিজেদের জীবনের নানা সুখ-দুঃখের কথা। কথা বলতে-বলতে যখন আর কথা কইতে ভালো লাগে না তখন দুজনে খানিক কুস্তি লড়ে। তাদের কুস্তিও খুব একঘেয়ে—কেউ হারে না। কেউ জেতে না। কুস্তি করে তাদের ক্লান্তিও আসে না, ঘামও ঝরে না। তার কারণ লালু আর ভুলু দুজনেই ভূত। প্রায় চোদ্দো বছর আগে দুই বন্ধু মনুষ্য জন্ম শেষ করে ভূত হয়ে লালগঞ্জের লাগোয়া বৈরাগী দিঘির ধারে আশ-শ্যাওড়ার জঙ্গলে ঘাঁটি গেড়ে আছে। মামলা-মোকদ্দমা থেকেই বাক্যালাপ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তবে আশ্চর্যের বিষয়, বুড়ো বয়সে মাত্র সাত দিনের তফাতে লালু আর ভুলু পটল তোলে। ভূত হয়ে যখন দুজনের দেখা হল তখন দু-জনের মনে হল পুরোনো ঝগড়া জিইয়ে রাখার আর কোনও মানেই হয় না। তাই দু-জনের বেশ ভালো ভাব হয়ে গেল। সময় কাটানোর জন্য তারা মাঝে-মাঝে ইচ্ছে করে ঝগড়া লাগানোর চেষ্টা করেও দেখেছে। কিন্তু দেখা গেল ঝগড়াটা তেমন জমে না, আরও একটা আশ্চর্যের বিষয় হল তারা ভূত হয়ে ইস্তক এ তল্লাটে কোথাও কখনও আর কোনও ভূতের দেখা পায়নি।

ভুলু বলে 'হ্যাঁরে লালু, গাঁয়ে গত চোদ্দো বছরে তো বিস্তর লোক মরেছে, তাদের ভূতগুলো সব গেল কোথায় বল তো?'

'সেটা তো আমিও ভাবছি, আমরা ছাড়া আর কাউকে তো কখনও দেখিনি! আরও কয়েকজন থাকলে সময়টা একটু কাটত ভালো।'

'ব্যাপারটা কিন্তু বড্ড গোলমেলে।'

'আমরাও ভালো ঠেকছে না! বেশিদিন এরকম চললে আমাদের এ গাঁ ছাড়তে হবে। সেটা কি সোজা! আমি গাঁ ছাড়ার চেষ্টা করে দেখেছি, ভারি সূক্ষ্ম একটা বেড়া আছে। চোখে দেখা যায় না এতই মিহি, সেই বেড়া ভেদ করা অসম্ভব।'

'বটে, এ তো ভারী অন্যায় কথা! আমরা কি সব জেলখানার কয়েদী নাকি রে?'

'মনে হয় এক জায়গার ভূত অন্য জায়গায় গেলে হিসেবের গোলমাল হবে বলেই যমরাজা বেড়া দিয়ে রেখেছে।'

'তা অলপ্পেয়ে যমরাজাটাই বা কোথায়? আজ অবধি তো তার দেখাটি পেলাম না।'

'হবে রে হবে। এই একঘেয়ে বসে থাকাটা আমার আর ভালো লাগছে না। বরং গাঁয়ের ভূতগুলো কোথায় গায়েব হচ্ছে সেটা জানা দরকার। আরও গোটা কয়েক হলে দিব্যি গল্পটল্প করা যেত। দল বেঁধে থাকতাম—'

'তাহলে খুঁজেই দেখা যাক।'

'তাই চলো।'

দুই বন্ধু মিলে অতঃপর ভূত খুঁজতে বেরোল। কিন্তু খুঁজতে-খুঁজতে হয়রানিই সার হল। একটা ভূতের গায়ের আঁশও দেখা গেল না।

'বড় চিন্তার কথা হল রে লালু!'

'বটেই তো এরকম তো হওয়ার কথা নয়।'

'একটা কথা বলি, যতীন মুৎসুদ্দির বয়স হয়েছে। অবস্থাও ক'দিন ধরে খারাপ যাচ্ছে। এখন-তখন অবস্থা। চল তো গিয়ে তার শিয়রে বসে থাকি। আত্মটা বেরোলেই খপ করে ধরবখন।'

'কথাটা মন্দ বলোনি। তাহলে চলো যাই।'

দুজনেই গিয়ে যতীন মুৎসুদ্দির শিয়রে আস্তানা গাড়ল। খুব সতর্ক চোখে চেয়ে রইল যতীনের দিকে। যতীন বুড়ো মানুষ শরীর জীর্ণ, শক্তিও নেই।

দুদিন ঠায় বসে থাকার পরে তিনদিনের দিন যখন গভীর রাত তখন লালু আর ভুলু লক্ষ করল যতীনের আত্মাটা নাকের ফুটোর কাছে বসে সাবধানে বাইরে উঁকিঝুঁকি মারছে।

লালু চেঁচিয়ে উঠল, 'ওই বেরোচ্ছে। সাবধান রে ভুলু, ঘ্যাঁচ করে ধরতে হবে কিন্তু।'

'হ্যাঁ, একবার বেরোক বাছাধন।'

তা আত্মাটা বেরোল বটে, কিন্তু ধরা গেল না। শরীর ছেড়ে হঠাৎ এমন চোঁ

করে এরোপ্লেনের মতোই উড়ে গেল নাকের ফুটো দিয়ে যে লালু-ভুলু হাঁ করে চেয়ে রইল। তারপর 'ধর-ধর' করে ছুটল পিছনে।

যতীন মুৎসুদ্দির আত্মা সোজা গিয়ে গণেশ গায়েনের বাড়িতে ঢুকে পড়ল। পিছু-পিছু লালু আর ভুলু।

গণেশ গায়েন যতীনের আত্মাকে দেখেই একগাল হেসে বলল, 'এসেছিস, তোকে নিয়ে সাত হাজার সাতশো পনেরোটা হল। দাঁড়া যতেন, দাঁড়া তোর শিশিটা বের করি। মলমটলম ভরে একদম রেডি করে রেখেছি।' এই বলে একটা দুই-ইঞ্চি সাইজের শিশি বের করে যতীনকে তার ভিতরে পুরে কয়েকটা নাড়া দিয়ে ছিপি বন্ধ করে তাকে রেখে দিল। তারপর আপন মনেই বলল, 'আর দুটো হলেই কেল্লা ফতে। পরশু ঝুনঝুনওয়ালা লাখ খানেক টাকা নিয়ে আসবে। সাত হাজার সাতশো সতেরোটা হলেই লাখ টাকা হাতে এসে যেত। টাইফয়েড হয়ে চোদ্দ বছর আগে শয্যা নিতে হল বলে লালু আর ভুলুর ভূত দুটো হাতছাড়া হল, নইলে আমাকে আজ পায় কে? সে দুটোকে পেলে হতো।'

লালু-ভুলু দরজার আড়ালে থেকে কথাটা শুনে ভয়ে সিঁটিয়ে রইল।

গণেশ গায়েন ঘুমোলে তারা ঘরের তাকে জমিয়ে রাখা সাত হাজার সাতশো পনেরোটা শিশি ভালো করে পরীক্ষা করে দেখল প্রত্যেকটিতে একটা করে ভূত মলম মেখে ঘুমিয়ে আছে।

'লালু দেখেছিস!'

'দেখছি রে ভুলু, কী করবি?'

'আয়, শিশিগুলোকে তাক থেকে ফেলে আগে ভাঙি।' তাই হল। দুজনে মিলে নিশুত রাতে ঝনঝন করে শিশিগুলোকে ঠেলে ফেলে দিল মেঝেতে। সঙ্গে-সঙ্গে ঘুমন্ত ভূতেরা জেগে মহা কোলাহল শুরু করে দিল।

ভুলু তাদের সম্বোধন করে বলল, 'ভাই বোনেরা, তোমরা ভয় পেয়ো না, আমরা তোমাদের উদ্ধার করতেই এসেছি।'

সবাই আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল।

গণেশ গায়েনও ঘুম ভেঙে উঠে ধমকাতে লাগল, 'চুপ-চুপ বেয়াদব কোথাকার! তোদের তো মন্তর দিয়ে বেঁধে রেখেছি।'

কে শোনে কার কথা। ভূতেরা মহানন্দে চিৎকার করতে-করতে লালু-ভুলুর সঙ্গে চোখের পলকে হাওয়া হয়ে গেল।

গণেশ দুঃখ করে বলল, 'সুখে থাকতে ভূতে কিলোয় রে। কত ভালো কাজ হত তোদের দিয়ে। ঝুনঝুনওয়ালা তোদের নিয়ে গিয়ে তার আয়ুর্বেদ ওষুধের কারখানায় চোলাই করে কর্কট রোগের ওষুধ বানাত, তা তোদের কপালে নেই। তা আমি আর কী করব?'

কালাচাঁদের দোকান

নবীনবাবু গরিব মানুষ। পোস্ট অফিসের সামান্য চাকরি। প্রায়ই এখানে-সেখানে বদলি যেতে হয়। আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের ভাবসাব নেই। প্রায়ই ধারকর্জ হয়ে যায়। ঋণ শোধ দিতে নাভিশ্বাস ওঠে। নবীনবাবুর গিন্নি স্বামীর ওপর হাড়ে চটা। একে তো নবীনবাবুর ট্যাঁকের জোর নেই, তার ওপর লোকটা বড্ড মেনিমুখো আর মিনমিনে। এই যে যখন-তখন যেখানে-সেখানে বদলি করে দিচ্ছে, নবীনবাবু যদি রোখাচোখা মানুষ হতেন তবে পারত ওরকম বদলি করতে? বদলির ফলে ছেলেপুলেগুলোর লেখাপড়ার বারোটা বাজছে। আজ এ স্কুল কাল অন্য স্কুল করে বেড়ালে লেখাপড়া হবেই বা কী করে?

এবার নবীনবাবু নিত্যানন্দপুর বলে একটা জায়গায় বদলি হলেন। খবরটা পেয়েই গিন্নি বললেন, 'আমি যাব না, তুমি যাও। আমি এখানে বাসাভাড়া করে থাকব। আর বদলি আমার পোষাচ্ছে না বাবু!'

নবীনবাবু মাথা চুলকে বললেন, 'তাতে খরচ বাড়বে বই কমবে না। ওখানে আমারও তো আলাদা ব্যবস্থা করতে হবে। দুটো এস্টাব্লিশমেন্ট টানব কী করে?'

গিন্নি বললেন, 'ঠিক আছে, যাব। কিন্তু তোমাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে এরপর বদলি করলে তুমি কিছুতেই বদলি হতে রাজি হবে না। সরকারকে পরিষ্কার জানিয়ে দিতে হবে যে, তুমি দরকার হলে মামলা করবে। তোমার মতো মেনিমুখো পুরুষদের পেয়েই তো নাকে দড়ি দিয়ে ওরা ঘোরায়।'

নবীনবাবু মিনমিন করে বললেন, 'একখানা দরখাস্ত নিয়ে ওপর-ওয়ালার সঙ্গে দেখা করেছিলাম। তা তিনি বললেন, নিত্যানন্দপুর থেকে আর বদলি করবে না। দেখা যাক।'

বাক্স-প্যাটরা গুছিয়ে সপরিবারে এক শীতের সন্ধেবেলা নবীনবাবু নিত্যানন্দপুরে এসে পৌঁছলেন। বেশ ধকল গেল। ট্রেন থেকে নেমে অনেকটা পথ গোরুর গাড়িতে এসে তারপর আবার নদী পেরিয়ে আরও ক্রোশ দুই পেরোলে তবে নিত্যান্দপুর। গঞ্জমতো জায়গা। তবে নিরিবিলি, ফাঁকা-ফাঁকা।

রাত্রিটা পোস্টমাস্টারের বাড়িতে কাটিয়ে পরদিন একখানা বাসা ভাড়া করলেন। পাকা বাড়ি, টিনের চাল। উঠোন আছে, কুয়ো আছে।

জায়গাটা ভালোও নয়, মন্দও নয়। ওই একরকম। তবে ভরসা এই যে, আর বারবার ঠাঁইনাড়া হতে হবে না ঃ ওপরওয়ালা কথা দিয়েছে এখানেই বাকি চাকরির জীবনটা কাটাতে পারবেন নবীনবাবু।

তাঁর স্ত্রী অবশ্য নাক সিঁটকে বললেন, 'কী অখেদ্দে জায়গা গো! এ যে ধাড়ধাড়া গোবিন্দপুর। অসুখ হলে ডাক্তারবদ্দি পাওয়া যাবে কি না খোঁজ নিয়ে দেখো। দোকানপাটও তো বিশেষ নেই দেখছি। বাজারহাট কোথায় করবে?'

নবীনবাবু, বললেন, 'বাজার এখান থেকে এক ক্রোশ। তাও রোজ বসে না। হপ্তায় দুদিন হাট।'

'তবেই হয়েছে। এখানে ইস্কুলটা কেমন খোঁজ নিয়েছ?'

'ইস্কুল একটা আছে মাইলটাক দূরে। কেমন কে জানে।'

'জায়গাটা এমন বিচ্ছিরি বলেই এখান থেকে তোমাকে আর বদলি না করতে ওপরওয়ালা সহজেই রাজি হয়ে গেছে। এখন মরি আমরা এখানে পচে।'

নবীনবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, 'কী আর করা। নিত্যানন্দপুরেই মানিয়ে গুছিয়ে নিতে হবে।'

প্রথমদিন বাজার করতে দু-ক্রোশ দূরে গিয়ে বেশ দমেই গেলেন তিনি। জিনিসপত্রের দাম বেশ চড়া। প্রত্যন্ত গাঁ, এখানে জিনিস আনতে ব্যাপারিদের অনেক খরচ হয়। জিনিসপত্র তেমন ভালোও নয়। পাওয়াও যায় না সবকিছু।

বাজারের হাল শুনে গিন্নি চটলেন। বললেন, 'আবার দরখাস্ত করে অন্য জায়গায় বদলি নাও। এ জায়গায় মানুষে থাকে? মা গো।'

নবীনবাবু ফাঁপড়ে পড়লেন। এখন কী করা যাবে তাই ভাবতে লাগলেন।

একদিন সন্ধেবেলা গিন্নি এসে বললেন, 'ওগো, খুকি তেলের শিশিটা ভেঙে ফেলেছে। একটি ফোঁটাও তেল নেই আর। রাতে রান্না হবে কী দিয়ে?'

'তেল পাব কোথায়?'

'দ্যাখো না একটু খুঁজে পেতে। অনেক গেরস্তবাড়িতে ছোটখাটো জিনিস পাওয়া যায় শুনেছি।'

অগত্যা নবীনবাবু বেরোলেন। বেশি লোকের সঙ্গে চেনাজানা হয়নি এখনও। কার বাড়ি যাবেন ভাবছেন। ডান হাতি পথটা ধরে হাঁটছেন। ডান ধারে একটু জঙ্গলমতো আছে। হঠাৎ দেখতে পেলেন, জঙ্গলের একটু ভেতর দিকে একটা আলোই যেন জ্বলছে মনে হল। নবীনবাবু কয়েক পা এগিয়ে ঠাহর করে দেখলেন একখানা ঝাঁপতোলা দোকান বলেই যেন মনে হচ্ছে। নবীনবাবু এগিয়ে গিয়ে দেখলেন, দোকানঘরই বটে। দীনদরিদ্র চেহারা হলেও দোকানই। কালো রোগাপনা কণ্ঠিধারী একজন লোক দোকানে বসে আছে। বিনয়ী মানুষ। নবীনবাবুকে দেখেই টুল থেকে উঠে বলল, 'আজ্ঞে আসুন।'

নবীনবাবু খুশি হলেন। আজকাল বিনয় জিনিসটা দেখাই যায় না। সরষের তেলের খোঁজ করতেই লোকটা বলল, 'আছে। ভালো ঘানির তেল।'

'কত দাম?'

লোকটা হেসে মাথা চুলকে বলল, 'দাম তো বেশ চড়া। তবে আপনার কাছ থেকে বেশি নেব না। ছ'টাকা করেই দেবেন।'

নবীনবাবু খুবই অবাক হলেন, দু-ক্রোশ দূরের বাজারে তেল দশ টাকা। নবীনবাবু আড়াইশো গ্রাম তেল কিনে আনলেন। গিন্নি তেল পরীক্ষা করে বললেন, 'বাঃ এ তো দারুণ ভালো তেল দেখছি। কোথায় পেলে গো?'

নবীনবাবু বললেন, 'আরে, কাছেই একটা বেশ দোকানের সন্ধান পেয়েছি। লোকটা বড় ভালো।'

লোকটা যে সত্যিই ভালো তার প্রমাণ পাওয়া গেল দুদিন পরেই। ডাল ফুরিয়েছে। সন্ধের পর সেই দোকানে গিয়ে হানা দিতেই বিনয়ী লোকটা প্রায় অর্ধেক দামে ডাল দিল। বলল, 'আপনকে অত দাম দিতে হবে না।'

নবীনবাবু ভদ্রতা করে জিগ্যেস করলেন, 'আপনার নামই তো জানি না এখনও।'

'আজ্ঞে, কালাচাঁদ নন্দী। 'কালো' বলেই ডাকবেন।'

'আপনি কি সব জিনিসই রাখেন কালোবাবু?'

'যে আজ্ঞে। তবে সন্ধের পর আসবেন। দিনমানে আমি দোকান খুলি না। ও সময়ে আমার চাষবাস দেখতে হয়।'

দিন দুই পর গিন্নি হঠাৎ বললেন, 'ও গো, আজ একটু পোলাও খাওয়ার বায়না ধরেছে ছেলেমেয়েরা। ঘি আর গরম মশলা লাগবে। এনে দেবে নাকি একটু?'

কালোর দোকানে ঘি বা গরম মশলা পাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছিল না নবীনবাবুর। দোনামনা করে গেলেন।

কালাচাঁদ বলল, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, কেন পাবেন না? এক নম্বর ঘি আছে, আর বাছাই গরম মশলা।'

'দাম?'

'দাম তো অনেক। তবে আপনাকে অত দিতে হবে না। দশ টাকা করেই দেবেন।'

নবীনবাবুর হৃদয় কৃতজ্ঞতায় ভরে গেল। খানিকক্ষণ কালাচাঁদের সঙ্গে সুখদুঃখের কথা বলে তিনি ফিরে এলেন। গিন্নি ঘি আর গরম মশলা দেখে খুব খুশি। বললেন, 'ওগো, দোকানটা খোকাকে চিনিয়ে দিয়ো তো! দরকার মতো ওকেও পাঠাতে পারব। তা হ্যাঁ গো, দোকানটা কি নতুন খুলেছে? আজ দাস বাড়ির গিন্নি গল্প করতে এসেছিল। কথায়-কথায় তাকে কালাচাঁদের দোকানের কথা বললুম। কিন্তু সে তো আকাশ থেকে পড়ল, 'সাত জন্মে কালাচাঁদবাবুর দোকানের কথা শুনিনি'।

'হবে হয়তো, নতুনই খুলেছে। আমি খোঁজ নিয়ে বলবখন।'

দুদিন পর ফের কালোজিরে আর ময়দা আনতে গিয়ে নবীনবাবু বললেন, 'তা হ্যাঁ কালাচাঁদবাবু, আপনার দোকনটা কতদিনের পুরোনো?'

কালাচাঁদ ঘাড়টাড় চুলকে অনেক ভেবে বলল, 'তা কম হবে না। ধরুন, এ-গাঁয়ের পত্তন থেকেই আছে।'

নবীনবাবুর একটু খটকা লাগল। দোকান যদি এত পুরোনোই হবে তাহলে দাস-গিন্নি এ দোকানের কথা শোনেনি কেন?

কালাচাঁদ যেন তাঁর মনের কথা পড়ে নিয়েই বলল, 'এ-গাঁয়ে আমার অনেক শত্রু। লোকের কথায় কান দেবেন না।'

'আচ্ছা তাই হবে।'

পরদিন নবীনবাবু দাস বাড়িতে নারায়ণপুজোর নেমন্তন্ন খেয়ে ফেরার পরই গিন্নি বললেন, 'হ্যা গো তোমার কলাচাঁদের দোকনটা কোথায় বলো তো! খোকাকে কুয়োর দড়ি আনতে পাঠিয়েছিলাম, সে তো দোকানটা খুঁজেই পেল না। পোস্ট অফিসের পিয়ন বিলাস এসেছিল। সেও বলল, 'ওরকম দোকান এখানে থাকতেই পারে না। বলল 'নবীনবাবু মাথাটাই গেছে।'

নবীনবাবুর বুকের মধ্যে একটু যেন কেমন করল। মুখে বললেন, 'কালাচাঁদের সঙ্গে অনেকের শত্রুতা আছে কিনা, তাই ওরকম বলে।'

পরদিন টর্চের ব্যাটারি আনতে গিয়ে নবীনবাবু এ-কথা সে-কথার পর কালাচাঁদকে বললেন, 'তা কালাচাঁদবাবু আমার ছেলেও কাল আপানার দোকানটা খুঁজে পায়নি।'

কালাচাঁদ বিনয়ের সঙ্গে বলল, 'আর কাউকে পাঠানোর দরকার কী? নিজেই আসবেন।'

'ইয়ে অন্যরা সব বলছে যে, কেউ নাকি এ-দোকানের কথা জানে না।'

কালাচাঁদ তেমনই মৃদু-মৃদু হেসে বলে, 'জানার দরকারই বা কী? আপনার ওসব নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না।'

নবীনবাবুর বুকটা একটু দুরু-দুরু করে উঠল। বললেন, 'হ্যাঁ, তা আমি তো আছিই। কিন্তু আমি ছাড়া দ্বিতীয় কোনও খদ্দের কখনও দেখি না। দোকানটা চলে কী করে?'

কালাচাঁদ বিনীতভাবে বলল, 'একজনের জন্যই তো দোকান।'

'অ্যাঁ!'

কালাচাঁদ হাসল, 'আসবেন।'

নবীনবাবু চলে এলেন। কিন্তু তারপর আবার পরদিনই গেলেন। মাসের শেষ, হাতে টাকা নেই। খুব সঙ্কোচের সঙ্গে বললেন, 'কয়েকটা জিনিস নেব। ধারে দেবেন?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, কেন নয়?'

'পরের মাসে মাইনে পেয়েই দিয়ে যাব।'

'তাড়া কীসের?'

ধারে প্রচুর জিনিস নিয়ে এলেন নবীনবাবু। পরের মাসে ধার শোধ করতে গেলে কালাচাঁদ জিভ কেটে বলল, 'না না অত নয়। আমার হিসেব সব লেখা আছে। পাঁচটি টাকা মোটে পাওনা। তাও সেটা দুদিন পর হলেও চলবে। বসুন, সুখ-দুঃখের কথা কই। টাকা-পয়সার কথা থাক।'

নবীনবাবু খুবই অবাক হলেন। পাঁচ টাকা পাওনা! বলে কী লোকটা? তিনি অন্তত দেড়শো টাকার জিনিস নিয়েছেন।

তা এভাবেই চলল। চাল, ডাল, মশলাপাতি, ঘি, তেল সবই কালাচাঁদের দোকান থেকে আনেন নবীনবাবু। মনোহারি জিনিস, বাচ্চাদের খেলনা, পোশাক, শাক-সবজিও ক্রমে-ক্রমে আনতে লাগলেন। মাছ-মাংসও পাওয়া যেতে লাগল কালাচাঁদের আশ্চর্য দোকানে। গিন্নি খুশি। নবীনবাবুর মাইনে অর্ধেকের ওপর বেঁচে যাচ্ছে।

নবীনবাবু একদিন গিন্নিকে বললেন, 'ওগো নিত্যানন্দপুর থেকে বদলি হওয়ার দরখাস্তটা আর জমা দেওয়া হয়নি।'

'দিয়ো না। হ্যাঁ গো কালাচাঁদের দোকানটা ঠিক কোথায় বলো তো। আমাকে একদিন নিয়ে যাবে?'

নবীনবাবু শশব্যস্তে বললেন, 'না-না, তোমাদের কারও যাওয়ার দরকার নেই। সকলের কি সব সয়?'

গিন্নি চুপ করে গেলেন।

নবীনবাবু নিত্যানন্দপুরেই রয়ে গেলেন।

ভূতের ভবিষ্যত

বাসবনলিনী দেবী অটো নাড়ু মেশিনের তিনটে ফুটোয় নারকেলকোরা, গুড় আর ক্ষীর ঢেলে লাল বোতামটা টিপে দিয়ে অঙ্কের খাতাটা খুলে বসলেন। এলেবেলে অঙ্ক নয়। বাসবনলিনী যেসব আঁক কষেন, তার ওপর নির্ভর করে বিজ্ঞান অনেক ভেলকি দেখিয়েছে। আলোর প্রতিসরণের ওপর তাঁর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হিসেব মহাকাশবিজ্ঞানে অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। এই দু-হাজার একান্ন সালে সৌরজগৎ ছাড়িয়ে অন্যান্য নক্ষত্রপুঞ্জে মানুষ যে যাতায়াত করতে পারছে, তার পিছনে বাসবনলিনীর অবদান বড় কম নয়।

যদি বয়সের প্রশ্ন ওঠে তো বলতেই হয় যে, বাসবনলিনীর বয়স হয়েছে। এই একশো একাশি বছর বয়সের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হয়েছে মোট চারবার। ডাক্তাররা যাকে বলেন ক্লিনিক্যাল ডেথ। তবে এক অসাধারণ প্রতিভার অধিকারিণী বলে আধুনিক চিকিৎসা ও শল্যবিজ্ঞানের সাহায্যে তাঁকে আবার বাঁচিয়ে তোলা হয়েছে। হৃদযন্ত্রটি অকেজো হয়ে যাওয়ায় সেটা বদল করে একেবারে পাকাপাকি যান্ত্রিক হৃদযন্ত্র বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। দুটো চোখই নতুন। কিডনিও পালটাতে হয়েছে। তা ছাড়া মস্তিষ্কের বার্ধক্য ঠেকাতে নিতে হয়েছে নানারকম থেরাপি। তিনি তিনবার নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। নামডাকও প্রচণ্ড। কিন্তু বাসবনলিনী একেবারে আটপৌরে মানুষ। আঁক কষেন, বিজ্ঞানচর্চা করেন, আবার নাতিপুতি নিয়ে দিব্যি ঘর-সংসারও করেন।

বলতে কী, তাঁর নাতিরাও রীতিমতো বুড়ো। তবে নাতিদের নাতিরা আছে, তস্য পুত্র-কন্যারা আছে। বাসবনলিনীর কি ঝামেলার অভাব? এই তো পাঁচুটা তিনদিন ধরে 'নাড়ু খাব, নাড়ু খাব' বলে জ্বালিয়ে মারছে। তাও অন্য কারও হাতের নাড়ু নয়, বাসবনলিনীর হাতের নাড়ু ছাড়া তার চলে না। পাঁচুর বয়স এই সবে আট। বাসবনলিনীর মেজো ছেলের সেজো ছেলের বড়ো ছেলের ছোট ছেলের সেজো ছেলে। কে যে কোন ছেলের কোন ছেলের কোন ছেলে, বা কোন মেয়ের কোন মেয়ের কোন মেয়ের মেয়ে, বা কোন ছেলের কোন মেয়ের কোন মেয়ে, সে-সব হিসেব রাখা চাট্টিখানি কথা নয়। বাসবনলিনীর একটা গার্হস্থ্য কমপিউটার আছে, তাতে সব তথ্য ভরা আছে। কে পাঁচু, কে হরি, কে গোপাল, কে তাদের বাপ-মা ইত্যাদি সব খবরই বাসবনলিনী চোখের পলকে জেনে নিতে পারেন। কাজেই, অসুবিধে নেই। তা ছাড়া কে কোনটা খেতে ভালোবাসে, কোনটা পরতে পছন্দ করে, কে একটু খুঁতখুঁতে, কে খোলামেলা, কে ভিতু, কে-ই বা দুর্বল, কে পেটুক, কে ঝগড়ুটে সবই কমপিউটারের নখদর্পণে।

কে যেন বলে উঠল, 'মা নাড়ু হয়ে গেছে। গরম খোপে ঢুকিয়ে দেব?'

কণ্ঠস্বরটি, বলাই বাহুল্য, মানুষের নয়। অটো নাড়ু মেশিনের।

বাসবনলিনী বিরক্ত হয়ে মেশিনের দিকে চেয়ে বললেন, ' তোর বুদ্ধির বলিহারি যাই মোক্ষদা, নাড়ু গরম খোপে রাখলে আঁট বাঁধবে কী করে শুনি!'

'ভুল হয়ে গেছে মা।'

'অত ভুল হলে চলে কী করে?' দেখছিস তো বড় কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছি। কাজ করিস, কিন্তু বুদ্ধি খাটাস না। কেমন করলি নাড়ু, দেখি, দে তো একটা।'

মেশিন থেকে একটা যান্ত্রিক হাত বেরিয়ে এল। তাতে একটা নাড়ু। বাসবনলিনী তার গন্ধ শুঁকে বললেন, 'খারাপ নয়, চলবে।' স্টোরেজে রেখে দে। তারপর সুইচ অফ করে দিয়ে একটু জিরিয়ে নে।

'আচ্ছা মা।' বলে মেশিন চুপ করে গেল।

খুক করে একটু কাশির শব্দ হওয়ায় বাসবনলিনী তাকালেন। তাঁর স্বামী আশুবাবু সসঙ্কোচে ঘরে ঢুকে এদিক-ওদিক কী যেন খুঁজছেন।

বাসবনলিনী চড়া সুরে বললেন, 'আবার এ-ঘরে ছোঁকছোঁক করছে কেন? একটু আগেই তো এক বাটি রাবড়ি আর চারখানা মালপোয়া খেয়ে চাঁদে বেড়াতে গিয়েছিলে। ফিরে এল কেন?'

আশুবাবুর বয়স একশো একানব্বই বছর। একটু রোগা হলেও বেশ শক্তসমর্থ চেহারা। ডায়াবেটিস থেকে শুরু করে অনেক রকম রোগ তাঁর শরীরে। একটু খাই-খাই বাতিক আছে। তাঁরও বার পাঁচেক ক্লিনিক্যাল ডেথ হয়েছে। শরীরের অনেক যন্ত্রপাতি অকেজো হওয়ায় বদলানো হয়েছে।

তিনি বিরস মুখে বললেন, ' ছোঁকছোঁক করি কি সাধে? নতুন যে গ্লাটন ট্যাবলেট খাচ্ছি, তাতে ঘণ্টায়-ঘণ্টায় খিদে পায়। চাঁদে গিয়ে একটু পায়চারি করতেই মার-মার করে ফের খিদে হল। সেখানে কলাইয়ের চপ আর ফুলুরির কাউন্টারটা

আজ আবার বন্ধ। আন্ডারগ্রাউণ্ড ক্যান্টিনে গিয়ে দেখি সিনথেটিক খাবার ছাড়া কিছুই নেই। তাই ফিরে এলুম।'

বাসবনলিনীর করুণা হল। মোক্ষদাকে ডেকে বললেন, 'ওরে, বাবুকে কয়েকখানা নাড়ু দে তো।'

নাড়ু পেয়ে আশুবাবু বিগলিত হাসি হাসলেন। দু'খানা দুগালে পুরে চিবোতে-চিবোতে আরামে চোখ বুজে এল। বললেন, ' তোমার হাতের কলাইয়ের ডালের বড়ি কতকাল খাই না। আজরাতে একটু বড়ির ঝাল হলে কেমন হয়?'

বাসবনলিনী বিরক্ত হয়ে আঁক কষতে-কষতেই একটা হাঁক দিলেন, 'ওরে ও খেঁদি, শুনতে পাচ্ছিস?'

'যাই মা।' বলে সাড়া দিয়ে একটা কালো বেঁটেমতো কলের মানবী এসে সামনে দাঁড়াল।

বাসবনলিনী বললেন, 'বাইরে কি বৃষ্টি হচ্ছে নাকি!'

'খুব বৃষ্টি হচ্ছে মা, সৃষ্টি ভাসিয়ে নিচ্ছে।'

'তা নিক। বুড়োকর্তা রাতে বড়ির ঝাল খাবেন। যা গিয়ে খানিকটা কলাইয়ের ডাল বেটে ভালো করে ফেটিয়ে রাখ। আমি দশ মিনিটের মধ্যে আসছি।'

খেঁদি চলে গেল।

আশুবাবু নাড়ু খেয়ে এক গেলাস জল পান করলেন। তারপর পেটে হাত বোলাতে-বোলাতে বললেন,, 'নাড়ুগুলো খাসা হয়েছে।'

বাসবনলিনী অঙ্কের খাতাটা বন্ধ করে উঠলেন। স্বামীর দিকে চেয়ে বললেন, 'ঘরে বসে থাকলে কেবল খাই-খাই করবে। তার চেয়ে যাও না একটু দক্ষিণ মেরু থেকে বেড়িয়ে এসো।'

আশুবাবু মাথা নেড়ে বললেন, 'দক্ষিণ মেরুতে ভদ্রলোক যায় কখনও?'

' কেন কী হয়েছে?'

' সেখানে সামিট মিটিং হবে বলে ঝাড়পোঁছ হচ্ছে। লোকেরা ভারি ব্যস্ত। খুব গাছটাছ লাগানো হচ্ছে, মস্ত-মস্ত হোটেল উঠেছে। অত ভিড় আমার সয় না। তার চেয়ে বরং আলাস্কায় গিয়ে একটু মাছ ধরে আনি।'

'তাই যাও। কিন্তু সন্ধে সাতটার মধ্যে ফিরে এসো। এখন কিন্তু দুপুর দেড়টা বাজছে।'

'হ্যাঁ গো হ্যাঁ, রাতে বড়ির ঝাল হবে, আমি কি আর দেরি করব?'

আশুবাবু বেরিয়ে গেলেন। বাসবনালিনী গিয়ে খেঁদির কাজ দেখলেন। ডাল বেশ মিহি করে বেটে ফেনিয়ে রেখেছে খেঁদি। বাসবনলিনী দেখে খুশি হয়ে বললেন, 'এবার অটোবড়ি মেশিন দিয়ে বড়িগুলো ভালো করে দে। যেন বেশ ডুমো-ডুমো হয়।'

'দিচ্ছি মা।'

বড়ি দেওয়া হতে লাগল। বাসবনলিনী জানলা খুলে দেখলেন। বাইরে সাঙ্ঘাতিক ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছে। বাসবনলিনী ঘরের দেওয়ালের একটা স্লাইডিং ডোর খুলে

কাচের ঢাকনাওলা বড়ি-বেলুনটা বের করলেন। এটা তাঁর নিজের আবিষ্কার। বড়ির ট্রেটা বেলুনের ঢাকনা খুলে তার মধ্যে বসিয়ে ফের ঢাকনা এঁটে দিলেন। তারপর দরজা খুলে চাকাওলা বড়ি-বেলুনটাকে বাইরে ঠেলে একটা হাতল টেনে দিলেন।

বড়ি-বেলুন দিব্যি গড়গড় করে গড়িয়ে উঠোনে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর ধীরে-ধীরে শূন্যে উঠে ক্রমে দৃষ্টির বাইরে হারিয়ে গেল। মাইল পাচেক ওপরে গিয়ে বড়ি-বেলুন স্থির হয়ে ভাসবে। ঢাকনা আপনা থেকে খুলে যাবে। চড়া রোদে বড়িগুলো দু-তিনঘণ্টার মধ্যে শুকিয়ে মুচমুচে হয়ে যাবে। না শুকোলে বড়ি-বেলুনের ম্যাগনিফায়ার রোদের তাপকে প্রয়োজনমতো দশ বা বিশ গুণ বাড়িয়ে দেবে। পাঁচ মাইল ওপরে কাকপক্ষীর উৎপাত নেই ঠিকই, তবে আন্তর্মহাদেশীয় নানা উড়ুক্কু যানের হামলা আছে। তাদের ধাক্কায় বড়ি-বেলুন বেশ কয়েকবার ঘায়েল হয়েছে। তাই এখন বড়ি-বেলুন একটা পাহারাদার কমপিউটার বসিয়ে দিয়েছে বাসবনলিনী। উড়ুক্কু যান দেখলেই বড়ি-বেলুন সাঁত করে প্রয়োজনমতো ডাইনে-বাঁয়ে বা ওপর নিচে সরে যায়।

বৃষ্টিটা খুব তেজের সঙ্গেই হচ্ছে বটে। এরকম আবহাওয়ায় বাসবনলিনীর বাড়ি থেকে বেরোতে ইচ্ছে করে না। জানলার ধারে বসে কেবল অঙ্ক কষতে ইচ্ছে করে। কিন্তু বাজারে একটু না গেলেই নয়। অবশ্য ঘর থেকে অর্ডার দিলে বাড়িতেই সব পৌঁছে যাবে, কিন্তু বাসবনলিনী নিজের হাতে বেছেগুছে শাকপাতা কিনতে ভালোবাসেন। নিজে না কিনলে পছন্দসই জিনিস পাওয়াও যায় না।

বেরোবার জন্য তৈরি হতে বাসবনলিনীর এক মিনিট লাগল। একটা বাবল শুধু পরে নিলেন। জিনিসটা কাচের মতোই স্বচ্ছ, তবে এত হালকা যে, গায়ে কিছু আছে বলে মনে হয় না। আসলে এই বাবল বা বুদ্বুদ গায়ের সঙ্গে সেঁটেও থাকে না। চারদিকে শুধু ডিমের খোলার মতো ঘিরে থাকে। গায়ে এক ফোঁটা জল বা বাতাসের ঝাপটা লাগতে দেয় না।

বুদ্বুদবন্দী হয়ে বাসবনলিনী বেরিয়ে পড়লেন। ইচ্ছে করলে গাড়ি নিতে পারতেন, তাঁর গ্যারেজে, রকমারি গাড়ি আর উড়ুক্কু যান আছে। কিন্তু হাঁটতে ভালোবাসেন বলে বাসবনলিনী কদাচিৎ গাড়ি নেন।

রাস্তায় অবশ্য যানবাহনের অভাব নেই। পেট্রল বা কয়লা বহুকাল আগেই ফুরিয়ে গেছে। তাই আজকাল গাড়ি চলে নানারকম শুকনো জ্বালানিতে। এসব জ্বালানি ছোট-ছোট ট্যাবলেট বা বড়ির আকারে কিনতে পাওয়া যায়। কোনও ধোঁয়া বা গন্ধ নেই। শব্দ হয় না। যাতায়াতের জন্য আর আছে চলন্ত ফুটপাত। আজকাল একরকম জুতো বেরিয়েছে যেগুলো পায়ে দিলে জুতো নিজেই হাঁটতে থাকে, যে পরেছে তাকে আর কষ্ট করে হাঁটতে হয় না।

তবে বাসবনলিনী এসব আধুনিক জিনিস পছন্দ করেন না তিনি পায়েহাঁটা পথ ধরে বাজারে এসে পৌঁছলেন।

বাজার বলতে বাগান। একটা বিশাল তাপনিয়ন্ত্রিত হলঘরে মাটিতে এবং শূন্যে হাজারো রকমের সবজির চাষ। ক্রেতারা গাছ থেকেই যে যার পছন্দমতো আলু-কুমড়ো

পটল তুলে নিচ্ছে। শূন্যে ঝুলন্ত র‍্যাকে আলুর গাছ। এসব আলুর জন্য মাটির দরকারই হয় না। শূন্যেই নানা প্রক্রিয়ায় গাছকে ফলন্ত করা হয়। গাছের নীচে চমৎকার আলু থোকাথোকা ফলে আছে। বাসবনলিনী কিছু আলু নিলেন। বেগুন-পটল-ফুলকপিও নিলেন। আজকাল সব ঋতুতেই সবরকম সবজি হয়। কোনও বাধা নেই।

বাজারের ফটকেই ছোট-ছোট ট্রলি সাজানো আছে। তাতে বোঝা তুলে দিয়ে কনসোলের মধ্যে নাম আর ঠিকানাটা একবার বলে দিলেই ট্রলি আপনা থেকেই গিয়ে বাড়িতে জিনিস পৌঁছে দিয়ে আসবে।

বাসবনলিনীও বোঝাটা একটা ট্রলি মারফত বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন। তারপর মেঘের ওপর হেঁটে বেড়ানোর একটু ইচ্ছে হল তাঁর। কোনও অসুবিধে নেই। উড়ন্ত পিরিচ সব জায়গায় মজুত। তিনি সবজি-বাজারের বাইরে উড়ন্ত পিরিচের গ্যারেজে ঢুকে একটা পিরিচ ভাড়া নিলেন। পাঁচ ফুট ব্যাসার্ধের পিরিচটা খুবই মজবুত জিনিসে তৈরি। তাতে একখানা আরামদায়ক চেয়ার আছে, কিছু খাদ্য পানীয়ের একখানা ছোট আলমারি আছে, আর আছে একজোড়া হাওয়াই চপ্পল। এই চপ্পল পরে আকাশে দিব্যি হেঁটে বেড়ানো যায়।

বুদ্বুদসমেত বাসবনলিনী পিরিচে চেপে বসলেন। পিরিচ একটা দ্রুতগামী লিফটের মতোই ওপরে উঠতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘন মেঘের স্তর ভেদ করে বাসবনলিনী রৌদ্রজ্বল আকাশে উঠে এলেন। চারদিকে কোপানো মাটির মতো মেঘ। আশেপাশে অনেক পিরিচ ভেসে বেড়াচ্ছে। তাতে নানা ধরনের মানুষ। তা ছাড়া বড়-বড় উড়ন্ত কার্পেটে দঙ্গল বেঁধে কোনও পরিবার পিকনিকও করছে। প্রচুর লোক। ওপরে-নীচে সর্বত্র। মেঘের ওপর ক্লাউড-স্কিও করছে কেউ-কেউ। হাওয়াই বুট পরে শূন্যে ফুটবল খেলছে কিছু যুবক। কয়েকজন যুবতী ভাসমান ফুচকাওলার কাছ থেকে ফুচকা কিনে খাচ্ছে।

পিরিচটা নিয়ে একটু এদিক-ওদিক ঘুরে বাসবনলিনী তাঁর বড়ি-বেলুনের কাছে এলেন। বড়িগুলো প্রায় শুকিয়ে এসেছে। আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই হয়ে যাবে।

হাওয়াই চপ্পল পরে নামতে যাবেন, এমন সময় ঠিক একটা কুমড়োর আকৃতির উড়ুক্কুগাড়ি তাঁর সামনে থেমে গেল। জানালা দিয়ে মুখ বের করে একটা ছোকরা হাসিমুখে বলে উঠল, 'কী গো ঠাকুমা, এখানে কী হচ্ছে? বড়ি রোদে দিয়েছ নাকি?'

ছোকরা আর কেউ নয় গদাধর ভটচাযের ডানপিটে ছেলে রেমো। রেমোর জ্বালায় বাসবনলিনীর এক সময়ে ঘুম ছিল না চোখে। গাছের আম-জাম-কাঁঠাল কিছু রাখা যেত না রেমোর জন্য। বিচ্ছুটা চুরিও করত নানা কায়দায়। একখানা লেজার গান দিয়ে টপাটপ পেড়ে ফেলত ফলপাকুড়, তারপর একটা খুদে পুতুলের মতো রোবটকে বাগানের দেওয়াল টপকে ঢুকিয়ে দিত। ফল কুড়িয়ে নিয়ে চলে আসতে রোবদের কোনও অসুবিধেই হত না। এই বড়ি-বেলুনের রোদে-দেওয়া আচার আমসত্ত্বও বড় কম চুরি করেনি রেমো। তাই তাকে দেখে বাসবনলিনী একটু শঙ্কিত হয়ে বললেন, 'আজ রাতে বড়ির ঝাল রাঁধব, তোকে একটু পাঠিয়ে দেব খন।'

রেমো একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'রাতের খাওয়া আজ যে কোথায় জুটবে কে জানে।'

'কেন রে, কী হল?'

'আর বলো কেন। গত একমাস ধরে বেস্পতির চারদিকে ঘুরপাক খেতে হয়েছে। আজ সবে ফিরছি। ফিরতে-ফিরতেই রেডিও-তে বদলির অর্ডার এল। আজই ইউরেনাসে রওনা হতে হবে। সেখানে রোবটারা নেমে মানুষের থাকার মতো ঘরবাড়ি তৈরি করেছিল। শুনছি সেইসব রোবটদের কয়েকজন নাকি এখন ভারী বেয়াড়াপানা শুরু করেছে। মানুষের কথা শুনছে না। কয়েকটা রোবট পালিয়ে গিয়ে বিপ্লবীর দল গড়েছে।'

বাসবনলিনী চোখ কপালে তুলে বললেন, 'বলিস কী! এ তো সব্বোনেশে কাণ্ড।'

রেমো একটু হেসে বলল, 'তোমরা পুরোনো আমলের লোক ঠাকুমা, এ যুগের কোনও খরব-ই রাখো না। তবে ভালোর জন্যই বলে রাখি, রোবটদের ঘরের কাজে বেশি লাগিও না। খাবার-দাবারে বিষটিসও মিশিয়ে দিতে পারে। একদম বিশ্বাস নেই ওদের।'

শুনে বাসবনলিনীর বুক ধড়ফড় করতে লাগল। হৃৎপিণ্ডটা কলের না হলে বুঝি বা হার্টফেলই করতেন। কোনওরকমে সামলে নিয়ে বললেন, 'তা এইসব কাণ্ড হচ্ছে, কিন্তু কই মুখপোড়ারা খবরের কাগজে তো কিছু লেখে না।'

রেমো হেসে কুটিপাটি হয়ে বলল, 'তুমি সত্যিই আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ি হয়ে গেছ ঠাকুমা। বলি, খবরের কাগজে খবর লেখে আর ছাপে কারা। তা জানো? অটোমেশিনের পাল্লায় পড়ে সবই তো যন্ত্র মগজের কবজায় চলে গেছে। তা তারা কি রোবটদের দুষ্টুমির কথা ছাপবে? সবই তো জ্ঞাতিভাই, তলায়-তলায় সকলের সাঁট। এমনকী রোবটরা তো রোবটল্যান্ডও দাবি করে বসেছে। ধর্মঘট, আইন অমান্যের হুমকিও দিচ্ছে। এসব শোনোনি?

'না বাছা, শুনিনি। আপন মনে বসে আঁক কষি, অতশত খবর তো কেউ বলেওনি।'

'যাই ঠাকুমা, মা-বাবার সঙ্গে একটু দেখা করে ইউরেনাসে রওনা দেব। সময় বেশি নেই।'

রেমো চলে যাওয়ার পর বাসবনলিনী হাওয়াই চপ্পল পরে একটু শূন্যে পায়চারি করলেন। বাতাস এখানে বড্ড পাতলা। শ্বাসের কষ্ট হয়। তাই বাসবনলিনী তাঁর অকসিজেন রুমাল মাঝে-মাঝে নাকে চেপে ধরছিলেন। কোনও দুষ্ট ছেলে যেন একটা কুকুরকে হাওয়াই জুতো পরিয়ে আকাশে ছেড়ে দিয়েছে। সেটা ঘেউঘেউ করে পরিত্রাহি চেঁচাতে-চেঁচাতে কাছ দিয়েই ছুটে গেল। আজকাল আকাশেও খুব একটা শান্তি নেই।

কিন্তু রোবটদের কথায় বাসবনলিনীর দুশ্চিন্তা বেড়ে গেছে। মনে স্বস্তি পাচ্ছেন না। মোক্ষদা, খেঁদি, পেঁচি, রোহিনী, মদনা, যামিনী এরকম অনেকগুলো রোবট-কাজের

লোক আছে বাসবনলিনীর। তার ওপর রোবট-গয়লা, রোবট-ধোপা, রোবট-নাপিত, রোবট-ফেরিওয়ালারও অভাব নেই। এদের যদি বিশ্বাস না করা চলে, তবে তো ভীষণ বিপদ। এর ওপর আছে রোবট-ডাক্তার, রোবট-নার্স। বাসবনালিনী খুবই দুশ্চিন্তায় পড়ে পিরিচে উঠে নিজের বাড়িতে ফিরে এলেন।

এসে দেখেন আশুবাবু গঙ্গারামকে হিন্দিতে বকঝকা করছেন। গঙ্গারাম নাকি বাগান কোপানোর কাজে ফাঁকি দিয়ে বসে-বসে বিড়ি টানছিল। আশুবাবু খুব তেজী গলায় বলছিলেন, 'ফের কভি বিড়ি ফুঁকেগা তো কান পাকাড়কে এয়সা মোচড় দেগা যে, আক্কেল একদম গুড়ুম হো যায়গা। বুঝেছিস'?

গঙ্গারাম একটু বোকাগোছের রোবট। তার কাজ বাগানের মাটি কুপিয়ে চৌকস করা। রোবটরা কখনও বিড়িটিড়ি খায় না। ওদের এতকাল কোনও নেশাটেশা ছিল না।

বাসবনলিনী আশুবাবুকে ইশারায় আড়ালে ডেকে বললেন, 'শোনো, এখন চাকর-বাকরদের ওপর অত হম্বিতম্বি কোরো না। দিনকাল পালটে গেছে।'

আশুবাবু খুব রেগে গিয়ে বললেন, 'কিন্তু আস্পদ্দা দ্যাখো, কাজে ফাঁকি দিয়ে বিড়ি খাচ্ছে। এতটা বাড়াবাড়ি কি সহ্য করা যায়?'

বাসবনলিনী চাপা গলায় বললেন, 'আঁ, আস্তে বলো শুনতে পাবে। বলি, রোবটরা যে সব দল বেঁধে বিপ্লবটিপ্লব কী সব শুরু করেছে, তা শুনেছ?'

আশুবাবু একটু বিস্মিত না হয়ে বললেন, 'শুনব না কেন? খুব শুনেছি। চতুর্দিকে স্যাবোটাজ শুরু করেছে ব্যাটারা। আশকারা পেয়ে এমন মাথায় উঠেছে যে, এখন রোবটল্যান্ড চাইছে। এর পর হয়তো আমাদের দিয়েই কাজের লোকদের কাজ করাতে চাইবে।'

বাসবনলিনী ভিতু গলায় বললেন, 'সব জেনেও গঙ্গারামের ওপর চোটপাট করছিলে? ও যদি ওর জাতভাইদের বলে দেয়, তা হলে কি তারা তোমাকে আস্ত রাখবে?'

আশুবাবু একগাল হাসলেন। তারপর, মৃদু স্বরে বললেন, 'অত সোজা নয়। আমার কাছে তার ওষুধ আছে।'

বাসবনলিনী অবাক হয়ে বললেন, 'কী ওষুধ?'

আশুবাবু খুব হেঁ-হেঁ করে হেসে বললেন, 'আছে। আমার ডার্করুমে লুকিয়ে রেখেছি। রোবটরা যে দুষ্টুমি শুরু করবে একদিন, তা আমি অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলাম। সেই জন্যে গোপনে বহুকাল ধরে ওষুধ বের করার চেষ্টা করেছি। এতদিনে ফল ফলেছে।'

'বলো কী! চলো তো তোমার ওষুধটা দেখব।'

'দেখাব, কিন্তু পাঁচ-কান করতে পারবে না। তোমরা তো পেটে কথা রাখতে পারো না।'

'না গো না, বিশ্বাস করেই দ্যাখো।'

আশুবাবু বাসবনলিনীকে নিয়ে মাটির তলায় একটা গুপ্তকক্ষে এসে ঢুকলেন। ঘরে যন্ত্রপাতি কিছুই প্রায় নেই। শুধু একটা কালো বাক্স। একটা লাল আলোর ডুম জ্বলছে।

একটা টুল দেখিয়ে আশুবাবু বাসবনলিনীকে বললেন, 'বোসো। যা দেখাব তা তোমার বিশ্বাস হবে না। তার চেয়েও বড় কথা, ভয়-টয় পেতে পারো।'

'জিনিসটা কী?'

'দেখলেই বুঝবে।'

এই বলে আশুবাবু কালো বাক্সটার গায়ে একটা হাতল ঘোরাতে লাগলেন। আর মুখে নানা কিম্ভুত শব্দ উচ্চারণ করতে লাগলেন, 'ওঁ ফট, ওঁ ফট, প্রেত প্রসীদ, প্রেতেণ পরিপূরিত জগৎ। জাগৎসার প্রেতায়া...ইত্যাদি।

বাসবনলিনী দেখলেন, কালো বাক্সটার গায়ে একটা ছোট্ট ফুটো দিয়ে কালো ধোঁয়ায় মতো কী একটু বেরিয়ে এসে বাতাসে জমাট বাঁধতে লাগল। তারপর চোখের পলকে সেটা একটা ঝুলকালো, রোগা শুঁটকো মানুষের চেহারা ধরে সামনে দাঁড়াল।

বাসবনলিনী আঁতকে উঠে বললেন, 'উঃ মা গো, এ আবার কে?'

আশুবাবু হেঁ-হেঁ করে হেসে বললেন, 'এদের কথা আমরা এতকাল ভুলেই মেরে দিয়েছিলুম গো। বহুকাল আগে এদের নিয়ে চর্চা হতো। আজকাল বিজ্ঞানের ঠেলায় সব আউট হয়ে গিয়েছিল।'

'কিন্তু লোকটা আসলে কে?'

এ কথার জবাব কালো লোকটাই দিল। কান এঁটো-করা হাসি হেসে খোনা স্বরে বলল, 'এজ্ঞে আমি হলুম গো ভূত। এক্কেবারে নির্জলা খাঁটি ভূত। বহুকাল ধরে দেখা-সাক্ষাতের চেষ্টা করছিলুম, হচ্ছিল না। তা এজ্ঞে, এবার এ-বাবুর দয়ায় হয়ে গেল।'

শুনে বাসবনলিনী গোঁ-গোঁ করে অজ্ঞান হলেন। তারপর জ্ঞান ফিরে এলে অবিশ্বাসের চোখে চেয়ে রইলেন। ভূতটা তখনও দাঁড়িয়ে।

আশুবাবু একখানা তালপাতার পাখায় বাসবনলিনীকে বাতাস দিতে-দিতে বললেন, 'আর ভয় নেই গিন্নি, ভূতেরা কথা দিয়েছে বিজ্ঞানের কুফল দূর করার জন্য জান লড়িয়ে দেবে। রোবটদেরও টিট করবে ওরাই।'

কেলে ভূতটা সঙ্গে-সঙ্গে মাথা নেড়ে বলে, 'এজ্ঞে, এক্কেবারে বাছাধনদের পেটের কথা টেনে বের করে আনব মাঠান, কোনও চিন্তা করবেন না।'

বাসবনলিনী এবার আর ভয় পেলেন না। খুব নিশ্চিন্ত হয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'বেঁচে থাকো বাবারা।'
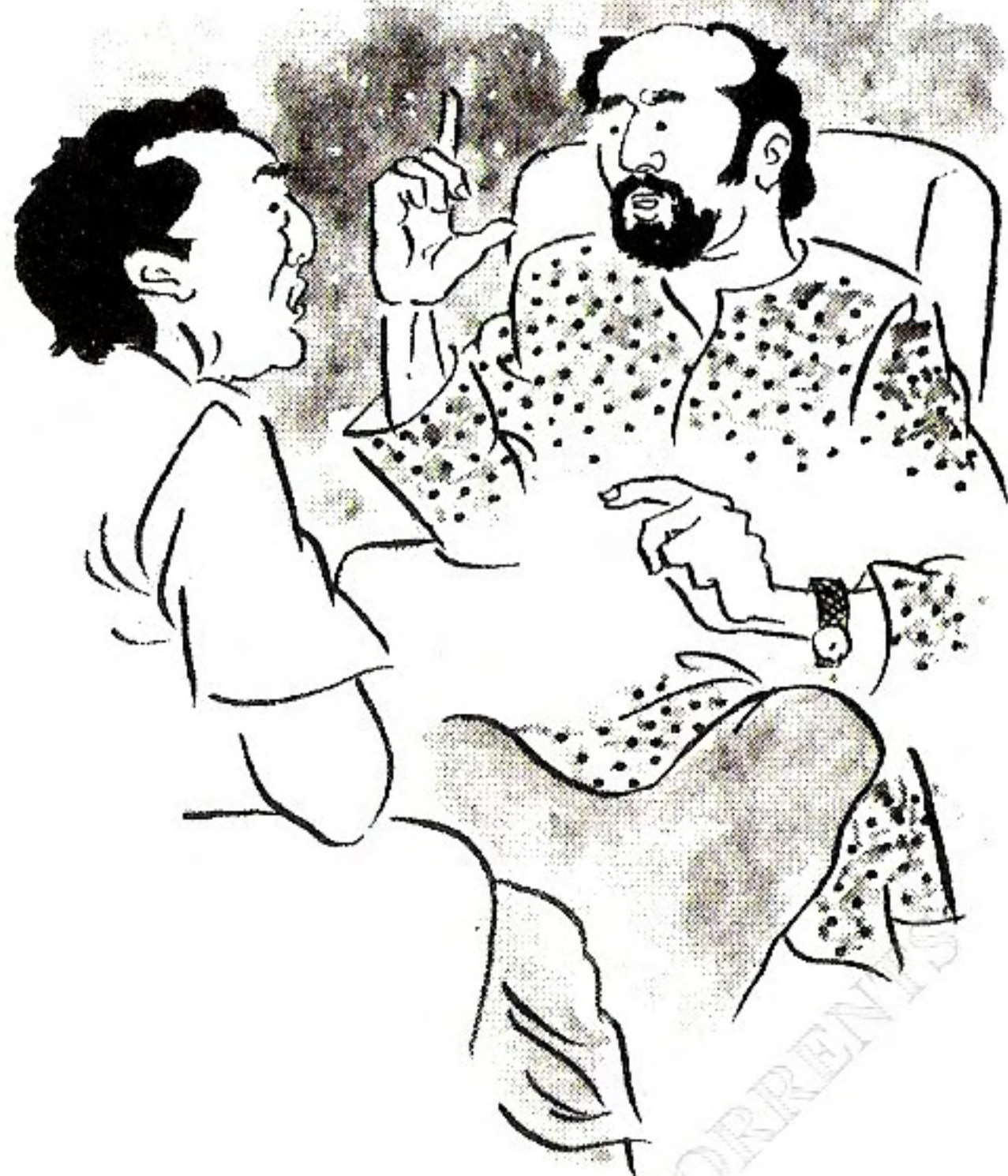
ভূত ও বিজ্ঞান

সন্ধে হয়ে আসছে। পটলবাবু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরলেন বলে বেশ জোরেই হাঁটছেন, জোরে হাঁটার আরও একটা কারণ হল আকাশে বেশ ঘন কালো মেঘ জমেছে, ঝড়বৃষ্টি এলে একটু মুশকিল হবে। তিনি আজ আবার ছাতাটা নিয়ে বেরোননি।

পায়ের হাওয়াই চপ্পলজোড়ার দিকে একবার চাইলেন পটলবাবু, দুখানা ছোটো ডিঙি নৌকোর সাইজের জিনিস, দেখতে সুন্দর নয় ঠিকই, কিন্তু ভারি কাজের জুতো। মাধ্যকর্ষণ-নিরোধক ব্যবস্থা থাকার ফলে আকাশের অনেকটা ওপর দিয়ে দিব্যি হাঁটচলা করা যায়। জুতোর ভিতরে ছোটো মোটর লাগানো আছে। সেটা চালু করলে আর পা নাড়ারও দরকার হয় না। ক্ষুদে বুস্টার রকেট তীব্রগতিতে গন্তব্যস্থলে নিয়ে যাবে। কিন্তু পটলবাবুর ইদানীং খুব বেশি গতিবেগ সহ্য হয় না, মাথা ঘোরে। স্ক্যান করে দেখা গেছে তাঁর স্নায়ুতন্ত্রে একটা গণ্ডগোল আছে। বেশি গতিবেগে গেলেই তাঁর মাথা ঘোরে এবং নানা উপসর্গ দেখা দেয়। সুতরাং পটলবাবু ভেসে-ভেসে হেঁটে চলেছেন। বৃষ্টি-বাদলা থেকে আত্মরক্ষার জন্য একটা বেলুন ছাতা হালে আবিষ্কার হয়েছে। ফোল্ডিং জিনিস, ভাঁজ খুলে জামার মতো পরে নিতে হয়, তারপর একটা বোতাম টিপলেই সেটা বেলুনের মতো ফুলে চারদিকে একটা ঘেরাটোপ তৈরি করে, ঝড়বৃষ্টিতে সেই বেলুনের কিছুই হয় না, সেই ছাতাটা না আনায় পটলবাবুর একটু দুশ্চিন্তা হচ্ছে।

এই তিন হাজার সাতচল্লিশ খৃস্টাব্দেও জলে ভিজলে মানুষের সার্দিকাশি হয় এবং সর্দিকাশির কোনও ওষুধে পটলবাবুর তেমন কাজ হয় না।

পকেটে টেলিফোনটা বিপ-বিপ করছিল, পটলবাবু টেলিফোনটা কানে দিয়ে বললেন, 'কে?'

'কে, পটলভায়া নাকি? আমি বিষ্ণুপদ বলছি।'

'বলো ভায়া।'

'বলি, তুমি এখন কোথায়?'

'আমি এখন উত্তর চব্বিশ পরগনার ওপরে, দু-হাজার সাতশো ফুট অল্টিচুডে রয়েছি। আকাশে কালবোশেখীর মেঘ এবং সঙ্গে ছাতা নেই।'

'বাঁচালে ভায়া। ঈশ্বরেরই ইচ্ছে বলতে হবে, আমি নবগ্রামে রয়েছি। এই উত্তর চব্বিশ পরগনাতেই।'

'বলো কী? তুমি তো ক'দিন আগেও হিউস্টনে ছিলে।'

'তারও আগে ছিলুম মঙ্গলগ্রহে। তার আগে নেপচুনে। আমার কি এক জায়গায় থাকলে চলে?'

'তা নবগ্রামে কী মনে করে?'

'একটা সমস্যার পড়েই আসা। তুমি নবগ্রামে নেমে পড়ো, কথা আছে।'

প্রস্তাবটা পটলবাবুর খারাপ লাগল না, ঝড়বৃষ্টিতে পড়ার চেয়ে নবগ্রামে পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে একটু আড্ডা মেরে যাওয়া বরং অনেক ভালো।

পটলবাবু বললেন, 'ঠিক আছে, কোথায় আছ সেটা বলো।

স্ক্যানার ছেষট্টি ক'তে জিরো ইন করো।'

পটলবাবু স্ক্যানার বের করে নবগ্রামের দিক নির্ণয় করে নিয়ে নম্বরটা সেট করলেন, তারপর স্ক্যানারের নির্দেশ অনুসরণ করে চলতে লাগলেন, নবগ্রাম সামনেই, কালবোশেখীর বাতাসটা শুরু হওয়ার আগেই নেমে পড়তে পারবেন বলে আশা হতে লাগল তাঁর।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর। পশ্চিম দিককার আকাশে যে কালো কুচকুচে মেঘে ঘন-ঘন বিদ্যুৎ ঝলকাচ্ছিল সেখান থেকেই হঠাৎ যেন একটা কালো গোল মেঘের বল কামানের গোলার মতোই তাঁর দিকে ছুটে আসতে লাগল। এরকম অতিপ্রাকৃত ব্যাপার তিনি কস্মিকালেও দেখেননি। পটলবাবু ভয় খেয়ে তাড়াতাড়ি হাওয়াই চপ্পলের ভাসমানতা কমিয়ে দিয়ে দ্রুত নিচে নামতে লাগলেন।

কিন্তু শেষরক্ষে হল না। মেঘের বলটা হুড়ুম করে এসে যেন তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। পটলবাবুর চারদিক একেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকারে ঢেকে গেল। ভয়ে তিনি সিঁটিয়ে গেলেন। কী করবেন বুঝে উঠতে না পেরে তিনি তাড়াতাড়ি পকেট থেকে টেলিফোনটা বের করলেন। অন্ধকারেও টেলিফোন করতে অসুবিধে নেই। ডায়ালের বোতামগুলো অন্ধকারেও জ্বলজ্বল করে।

কিন্তু টেলিফোন করার সুযোগটাই পেলেন না তিনি। কে যেন হাত থেকে টেলিফোনটা কেড়ে নিয়ে গেল।

তারপর যা হতে লাগল তা পটলবাবুর সুদূর কল্পনারও বাইরে। মেঘের গোলাটা তাঁকে যেন খানিক লোফালুফি করে হু-হু করে ওপরের দিকে টেনে নিয়ে যেতে লাগল। পটলবাবু চেঁচাতে লাগলেন, 'বাঁচাও! বাঁচাও!'

কানের কাছে কে যেন বজ্রনির্ঘোষে বলল, 'চোপ।'

ভয়ে পটলবাবু বাক্যহারা হলেন, কিন্তু ধমকটা কে দিল তা বুঝতে পারলেন না।

মেঘের বলটা তাঁকে নিয়ে এত ওপরে উঠে যাচ্ছে যে পটলবাবুর ভয় হতে লাগল, আরও ওপরে উঠলে তিনি নির্ঘাৎ কৃত্রিম উপগ্রহগুলোর উচ্চতায় পৌঁছে যাবেন। সেক্ষেত্রে হাওয়াই চপ্পল কাজ করে না। অক্সিজেনের অভাবে শ্বাসবায়ু বন্ধ হয়ে যাবে এবং তাঁর মৃতদেহ পৃথিবীর চারদিকে ঘুরপাক খাবে।

আচমকাই মেঘের বলটা থেমে গেল। এবং ধীরে-ধীরে চারদিককার অন্ধকার কেটে যেতে লাগল। মেঘ কেটে যাওয়ার পর পটলবাবু যা দেখলেন তাতে ভিরমি খাওয়ার জোগাড়। পৃথিবী থেকে অন্তত দুশো মাইল ওপরে তিনি নিরালা শূন্যে দাঁড়িয়ে আছেন, একদম একা।

কে যেন বলে উঠল, এই যে পটল।

পটলবাবু ঘাড় ঘুরিয়ে যাকে দেখলেন তাতে তাঁর হৃদকম্প হতে লাগল।

বৈজ্ঞানিক হরিহর সর্বজ্ঞ। কিন্তু সমস্যা হল হরিহর এই গত জানুয়ারি মাসে একশো পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে মারা গেছেন।

কাঁপা গলায় পটলবাবু বললেন, 'আ আপনি?'

শূন্যে দুখানা চেয়ার পাতলেন হরিহর। তারপর বললেন, 'বোসো হে পটল, কথা আছে।'

পটলবাবু কম্পিত বক্ষে বসলেন, দুশো মাইল উচ্চতায় হাওয়ার কোনও ঘন স্তর নেই। তাঁর হাওয়াই চপ্পল কাজ করছে না, তবু চেয়ার দুটো দিব্যি ভেসে রয়েছে। আর শ্বাসকষ্টও হচ্ছে না।

হরিহর বললেন, 'ভয় পেও না।'

'আমাদের চারদিকে একটা বলয় রয়েছে। তোমার শ্বাসকষ্ট হবে না, ঠান্ডাও লাগবে না পড়েও যাবে না। নিচে এখন প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে তার চেয়ে এ জায়গাটা অনেক নিরাপদ, কী বলো?'

'যে আজ্ঞে। কিন্তু আপনি তো—'

মারা গেছি? হাঃ-হাঃ-হাঃ। আমি মরায় তোমাদের খুব সুবিধে হয়েছে, না? শোনো বাপু, আমি ভূতপ্রেত নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করতুম বলে কেউ আমাকে তেমন গুরুত্ব দেয়নি, প্রকাশ্যেই আমাকে পাগল আর উন্মাদ বলা হত। সেই দুঃখে আমি নবগ্রামে একটা নির্জন বাড়িতে ল্যাবরেটরি বানিয়ে নিজের মনে গবেষণা করতে

থাকি। একদিকে যখন তোমরা জড়বিজ্ঞান নিয়ে পৃথিবী তোলপাড় করছ, অন্যদিকে তখন আমি এক অজ্ঞাত জগতের সন্ধান করতে থাকি, তাতে যথেষ্ট কাজও হয়। ধীরে-ধীরে দেহাতীত জগতের রহস্য ধরণা পড়তে থাকে। আমার নানারকম কিম্ভুত যন্ত্রে আত্মাদের অস্তিত্ব নির্ভুলভাবে রেকর্ড হতে থাকে। তারপর একদিন আমি তাদের পরম বন্ধু হয়ে উঠি। আমার গবেষণায় শেষে তারাও সাহায্য করতে থাকে।'

পটলবাবু সচকিত হয়ে বলেন, 'ভূত? কিন্তু ভূত তো—'

কী বলবে জানি। ভূত একটা বোগাস ব্যাপার, এই তো! বাপু হে এই যে মহাশূন্যে ভেসে আছ, কোনও স্পেসস্যুট বা অক্সিজেন বা যন্ত্রপাতি ছাড়া—এটা কি তোমার বিজ্ঞান ভাবতে পারে?

মাথা নেড়ে পটলবাবু বললেন, 'আজ্ঞে না।'

'তবে? বিজ্ঞান শিখে এ সব না-মানার অভ্যাস মোটেই ভালো নয়, বুঝলে।'

'যে আজ্ঞে।'

এখন যা বলছি শোনো। তোমার বন্ধু বিষ্ণুপদ সাঁতরা আমার গোপন ল্যাবরেটরির সন্ধান পেয়েছে। সেইখান থেকেই তোমাকে টেলিফোনে ডাকাডাকি করছিল। কিন্তু সে জড়বাদী বিজ্ঞানী, অবিশ্বাসী। সে আমার ল্যাবরেটরিতে নানারকম আধুনিক যন্ত্রপাতি ঢুকিয়ে সব তছনছ করছে। সে আমাকে সত্যিকারের পাগল বলে প্রতিপন্ন করতে চায়। বুঝেছ।

'যে আজ্ঞে।'

আমি জানি তুমি তেমন খারাপ লোক নও। তাই তোমাকে একটি কাজের ভার দিচ্ছি। তুমি বিষ্ণুপদকে আটকাও।

'যে আজ্ঞে।'

'তারপর তুমি নিজে আমার ল্যাবরেটরিতে ভূত আর বিজ্ঞান মেশাতে থাকো। আমি তোমাকে সাহায্য করব।'

'ভূত আর বিজ্ঞান কি মিশ খাবে হরিহর কাকা?'

'খুব খাবে-খুব খাবে। খাচ্ছে যে, তা তো দেখতেই পাচ্ছ।'

'তা অবশ্য ঠিক, কিন্তু আমি কি পারব? আমার তো নিজের গবেষণা—'

'উহুঁ, নিজের গবেষণা তোমাকে ছাড়তে হবে। আমার ভূত-বিজ্ঞান রসায়ন গবেষণাগারের ভার তোমাকেই নিতে হবে নইলে—'

পটলবাবুর মাথা ঝিমঝিম করছিল, রাজি না হলে কী হবে তা ভাবতেও পারছিলেন না। ঘাড় কাত করে বললেন, 'আজ্ঞে তাই হবে।'

'তাহলে চলো, নামা যাক।'

চেয়ার দুটো দিব্যি সোঁ-সো করে নামতে লাগল। বায়ুস্তরে নেমে হরিহর বললেন, 'এবার নিজে-নিজেই নামো, ঝড়বৃষ্টি থেমে গেছে।'

'যে আজ্ঞে', বলে পটলবাবু নামতে লাগলেন।

মাঝি

জয়চাঁদ বিকেলের দিকে খবর পেল, তার মেয়ে কমলির বড় অসুখ, সে যেন আজই একবার গাঁয়ের বাড়িতে যায়।

খবরটা এনেছিল দিনু মণ্ডল, তার গাঁয়েরই লোক।

জয়চাঁদ তাড়াতাড়ি বড় সাহেবকে বলে ছুটি নিয়ে নিল। বুকটা বড় দুরদুর করছে। তার ওই একটিই মেয়ে, বড্ড আদরের। মাত্র পাঁচ বছর বয়স। অসুখ হলে তাদের গাঁয়ে বড় বিপদের কথা। সেখানে ডাক্তার-বদ্যি নেই, ওষুধপত্র পাওয়া যায় না। ওষুধ বলতে কিছু পাওয়া যায় মুদির দোকানে, তা মুদিই রোগের লক্ষণ শুনে ওষুধ দেয়। তাতেই যা হওয়ার হয়। কাজেই জয়চাঁদের খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছিল।

দুশ্চিন্তার আরও কারণ হল, আজ সকাল থেকেই দুযোর্গ চলছে। যেমন বাতাস তেমনি বৃষ্টি। এই দুর্যোগের দিনে সুন্দরবনের গাঁয়ে পৌঁছনো খুবই কঠিন ব্যাপার।

দিনু মণ্ডল বলল, পৌঁছতে পারবে না বলে ধরেই নাও। তবে বাস ধরে যদি

ধামাখালি অবধি যাওয়া যায় তাহলে খানিকটা এগিয়ে থাকা হল। সকালবেলায় নদী পেরিয়ে বেলাবেলি গাঁয়ে পৌঁছনো যাবে।

জয়চাঁদ মাথা নেড়ে বলল, 'নাঃ, আজই পৌঁছনোর চেষ্টা করতে হবে। মেয়েটা আমার পথ চেয়ে আছে।'

জয়চাঁদ আর দিনু মণ্ডল দুর্যোগ মাথায় করেই বেরিয়ে পড়ল। যাওয়ার পথে একজন ডাক্তারবাবুর চেম্বারে ঢুকে মেয়ের রোগের লক্ষণ বলে কিছু ওষুধও নিয়ে নিল জয়চাঁদ। এর পর ভগবান ভরসা।

বৃষ্টির মধ্যেই বাস ধরল তারা। তবে এই বৃষ্টিতে গাড়ি মোটে চলতেই চায় না। দু-পা গিয়েই থামে। ইঞ্জিনে জল ঢুকে গাড়ি বন্ধ হয়ে যায় বারবার। যত এসব হয় ততই জয়চাঁদ ধৈর্য্য হারিয়ে ছটফট করতে থাকে।

যে গাড়ি বিকেল পাঁচটায় ধামাখালি পৌঁছোনোর কথা, পৌছতে-পৌঁছতে রাত নটা বেজে গেল। ঝড়, বৃষ্টি আরও বেড়েছে। ঘাটের দিকে কোনও লোকজনই নেই। তবু ছাতা মাথায় ভিজতে-ভিজতে দুজনে ঘাটে এসে দেখল, নৌকো বা ভটভটির নাম-গন্ধ নেই। নদীতে বড়-বড় সাঙ্ঘাতিক ঢেঠ উঠেছে। বাতাসের বেগও প্রচণ্ড। উন্মাদ ছাড়া এই আবহাওয়ায় কেউ নদী পেরোবার কথা কল্পনাও করবে না এখন।

দিনু মণ্ডল বলল, 'চলো ভায়া, বাজারের কাছে আমার পিসতুতু ভাই থাকে, তার বাড়িতেই আজ রাতটা কাটাই গিয়ে।'

জয়চাঁদ রাজি হলো না। বলল, 'তুমি যাও দিনু দাদা, আমি একটু দেখি, যদি কিছু পাওয়া যায়।'

পাগল নাকি? আজ নৌকো ছাড়লে উপায় আছে? তিনহাত যেতে-না-যেতে নৌকো উলটে তলিয়ে যাবে।

জয়চাঁদ হতাশ গলায় বলল, 'ঠিক আছে। তুমি তোমার ভাইয়ের বাড়িতে জিরোও গিয়ে। আমি যদি উপায় করতে না পারি তাহলে একটু বাদে আমিও যাচ্ছি।'

দিনু মণ্ডল ফিরে গেল। জয়চাঁদ দাঁড়িয়ে রইল ঘাটে। ছাতা হাওয়ায় উলটে গেছে অনেকক্ষণ। ঘাটে কোনও মাথা গোঁজার জায়গাও তেমন নেই। জয়চাঁদ বৃষ্টি-বাতাস উপেক্ষা করে ঘাটে ভিজতে লাগল। মেয়ের কথা ভেবে কাঁদলও খানিক। কে জানে কেমন আছে মেয়েটা! ভগবানই ভরসা।

কতক্ষণ কেটেছে তা বলতে পারবে না জয়চাঁদ। সময়ের হিসেব তার মাথা থেকে উড়ে গেছে। বসে আছে তো বসেই আছে। ঝড়-বৃষ্টি একসময়ে প্রচণ্ড বেড়ে উঠল। এমন সাঙ্ঘাতিক যে জয়চাঁদ দুবার বাতাসের ধাক্কায় পড়ে গেল। জলে-কাদায় মাখামাখি হল সর্বাঙ্গ।

সামনেই ঘুটঘুট্টি অন্ধকার নদী। নদীতে শুধু পাঁচ-সাত হাত উঁচু বড়-বড় ঢেউ উঠছে। সত্যিই এই নদীতে দিশি নৌকো বা ভটভটি চলা অসম্ভব। জয়চাঁদ তবু যে

বসে আছে তার কারণ, এই নদীর ওপাশে পৌঁছলে আরও পাঁচ-সাত মাইল দূরে তার গাঁ। এখান থেকে সে যেন গাঁয়ের গন্ধ পাচ্ছে, মেয়েকে অনুভব করতে পারছে।

গভীর ভাবে ভাবতে-ভাবতে হঠাৎ একটু চমকে উঠল জয়চাঁদ। ভুল দেখল নাকি? অন্ধকারে নদীর সাদাটে বুকে ঢেউয়ের মাথায় একটা ডিঙি নৌকো নেচে উঠল না? চোখ রগড়ে জয়চাঁদ ভালো করে চেয়ে দেখল। দুটো ঢেউ তীরে আছড়ে পড়ার পর এবার সে সত্যিই দেখল, একটা ঢেউয়ের মাথায় ছোট্ট একটা ডিঙি নৌকো ভেসে উঠেই আবার তলিয়ে গেল। এ দুর্যোগে কেউ ডিঙি বাইবে এটা অসম্ভব। তবে এমন হতে পারে, ডিঙিটা কোনও ঘাটে বাঁধা ছিল, ঝড়ে দড়ি ছিঁড়ে বেওয়ারিশ হয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে।

হঠাৎ জয়চাঁদের মাথায় একটা পাগলামি এল। সে একসময় ভালোই নৌকো বাইত। ডিঙিটা ধরে একবার চেষ্টা করবে? পারবে না ঠিক কথা, কিন্তু এভাবে বসে থাকারও মানে হয় না। ডিঙি নৌকো সহজে ডোবে না। একবার ভেসে পড়তে পারলে কে জানে কী হয়।

জয়চাঁদ তার ঝোলা ব্যাগটা ভালো করে কোমরে বেঁধে নিল। তারপর ঘাটে নেমে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ডিঙিটা একটা গোঁত্তা খেয়ে নাগালের মধ্যেই চলে এসেছে প্রায়। জয়চাঁদ ঢেউয়ের ধাক্কায় পিছিয়ে এবং ফের এগিয়ে কোনওরকমে ডিঙিটার কানা ধরে ফেলল। এই ঝড়-জলের সঙ্গে যুদ্ধ করে ডিঙি ধরে রাখা মুশকিল। জয়চাঁদ ডিঙিটাকে টেনে আনল পাড়ে। তারপর অন্ধকার হয়ে যাওয়া চোখে যা দেখল তাতে তার চোখ চড়কগাছ। নৌকোর খোলের মধ্যে জলে একটা লোক পড়ে আছে। সম্ভবত বেঁচে নেই।

জয়চাঁদ বড় দুঃখ পেল। লোকটা বোধহয় পেটের দায়েই মাছ-টাছ ধরতে এই ঝড় জলে বেরিয়েছিল। প্রাণটা গেল। জয়চাঁদ নৌকটা ঘাটের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে লোকটাকে পাঁজা কোলে তুলে এনে ঘাটের পাথরে উপুড় করে শোয়াল। প্রাণ থাক বা না থাক, বাঁচানোর একটা চেষ্টা তো করা দরকার। সে লোকটার পিঠ বরাবর ঘন-ঘন চাপ দিতে লাগল। যাতে পেটের জল বেরিয়ে যায়। সে হাতড়ে-হাতড়ে বুঝতে পারল, লোকটা বেশ রোগা, জরাজীর্ণ চেহারা। বোধহয় বুড়ো মানুষ।

খানিকক্ষণ চেষ্টার পর যখন জয়চাঁদ হাল ছেড়ে দিতে যাচ্ছিল তখন লোকটার গলা দিয়ে একটা অস্ফুট আওয়াজ বেরিয়ে এল। উঃ বা আঃ গোছের। জয়চাঁদ দ্বিগুণ উৎসাহে লোকটাকে কিছুক্ষণ দলাই-মলাই করল। প্রায় আধঘণ্টা পর লোকটার চেতনা ফিরে এল যেন।

লোকটি বলল, 'কে বটে তুমি?'

'আমাকে চিনবেন না। গাঙ পেরোবার জন্য দাঁড়িয়েছিলুম, হঠাৎ আপনার ডিঙিটা চোখে পড়ল।'

লোকটা উঠে বসল। ঝড়ের বেগটা একটু কমেছে। বৃষ্টির তোড়টাও যেন

আগের মতো নয়। লোকটা কোমর থেকে গামছা খুলে চোখ চেপে কিছুক্ষণ বসে থেকে বলল, 'ওঃ বড্ড ফাঁড়া গেল আজ। প্রাণে যে বেঁচে আছি সেই ঢের। তা তুমি যাবে কোথা?'

জয়চাঁদ হতাশ গলায় বলল, 'যাবো ক্যাওটা গাঁয়ে। ওপার থেকে পাঁচ-সাত মাইল পথ। মেয়েটার বড্ড অসুখ খবর পেয়েই যাচ্ছিলুম। তা সে আর হয়ে উঠল না দেখছি।'

লোকটা বলল, 'হু। কেমন অসুখ?'

'ভেদবমি হয়েছে শুনেছি। কলেরা কিনা কে জানে। গিয়ে জ্যান্ত দেখতে পাব কিনা বুঝতে পারছি না।'

লোকটা বলল, 'মেয়েকে বড্ড ভালোবাসো, না?'

'তা বাসি। বড্ডই বাসি। মেয়েটাও বড্ড বাবা-বাবা করে।'

লোকটা হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল, 'চলো তাহলে।'

জয়চাঁদ অবাক হয়ে বলল, 'কোথায়?'

'তোমাকে পৌঁছে দিই।'

'খেপেছেন নাকি? কোনওরকমে প্রাণে বেঁচেছেন, এখন নৌকো বাইতে গেলে মারা যাবেন নির্ঘাত। আমার মেয়ের যা হওয়ার তা হয়েই গেছে। আর এই দুর্যোগে নদী পেরোনো সম্ভবও নয়।'

রোগা লোকটা গামছাটা কোমরে বেঁধে নিয়ে বলল, 'ওহে, বাঁচা-মরা তো আছেই, সে কি আমাদের হাতে? আমাদের হাতে যা আছে তা হল, চেষ্টা। চলো, নৌকোয় উঠে পড়ো, তারপর ভগবান যা করেন।'

লোকটার গলার স্বরে কী ছিল কে জানে, জয়চাঁদ উঠে পড়ল।

বুড়ো লোকটা নৌকোর খোল থেকে একটা বৈঠা তুলে নিয়ে গলুইয়ে বসল। অন্য প্রান্তে জয়চাঁদ। উত্তাল ঢেউয়ে নৌকোটা ঠেলে দিয়ে লোকটা বৈঠা মারতে লাগল।

ডিঙিটা একটা ঢেউয়ের মাথায় উঠে পরমুহূর্তেই জলের উপত্যকায় নেমে যাচ্ছিল। আবার উঠল, আবার নামল। ওঠা আর নামা। মাঝ দরিয়ায় প্রচণ্ড তুফানে উত্তাল ঢেউয়ে ডিঙিটা যেন ওলট-পালট খেতে লাগল। কিন্তু জয়চাঁদ দুহাতে শক্ত করে নৌকোর দুটো ধার চেপে ধরে অবাক চোখে দেখল, জীর্ণ বৃদ্ধ মানুষটা যেন শাল খুঁটির মতো দাঁড়িয়ে। হাতের বৈঠা যেন জলকে তোলপাড় করে সব বাধা ভেঙে নৌকোটাকে তীরগতিতে নিয়ে চলেছে।

একটা বিশাল দোতলা সমান ঢেউ তেড়ে আসছিল বাঁ-দিক থেকে। জয়চাঁদ সেই করাল ঢেউয়ের চেহারা দেখে চোখ বুজে ফেলেছিল।

কে যেন চেঁচিয়ে বলল, 'জয়চাঁদ, ভয় পেও না।'

অবাক হয়ে জয়চাঁদ ভাবল, আমার নাম তো এর জানার কথা নয়।

ঢেউয়ের পর ঢেউ পার হয়ে এক সময়ে নৌকোটা ঘাটে এসে লাগল। লোকটা

লাফ দিয়ে নেমে ডিঙিটাকে ঘাটের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে ফেলে বলল, 'এ ঘাট চেনো জয়চাঁদ?'

জয়চাঁদ অবাক হয়ে অন্ধকারে একটা মস্ত বটগাছে দিকে চেয়ে বলল, 'কী আশ্চর্য! এ তো আনন্দপুরের ঘাট। এ ঘাট তো আমার গাঁয়ের লাগোয়া! এখানে এত তাড়তাড়ি কী করে এলাম? নৌকোয় আনন্দপুর আসতে তো সাত-আট ঘণ্টা সময় লাগে।'

'ঝড়ের দৌলতে আসা গেছে বাবু।'

জয়চাঁদ মাথা নেড়ে বলল, 'না। ঝড় তো উলটোদিকে। যাহোক, পৌঁছে তো গেছ।'

জয়চাঁদ একটু দ্বিধায় পড়ে হঠাৎ বলল, 'আপনি কে?'

'আমি! আমি তো একজন মাঝি। তোমার দয়ায় প্রাণ ফিরে পেয়েছি।'

জয়চাঁদের চোখে জল এল। মাথা নেড়ে বলল, 'আপনাকে প্রাণ ফিরে দিতে পারি তেমন ক্ষমতা আমার নেই। আপনি আসলে কে?'

'বাড়ি যাও জয়চাঁদ। মেয়েটা তোমার পথ চেয়ে আছে।'

জয়চাঁদ চোখের জল মুছে পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে যেতেই লোকটা পা সরিয়ে নিয়ে বলল, 'করো কী জয়চাঁদ, করো কী? বাড়ি যাও জয়চাঁদ।'

'গিয়ে? '

'মেয়ের কাছে যাও। সে ভালো আছে। অসুখ সেরে গেছে।'

জানি মাঝি, আপনি যাকে রক্ষা করেন তাকে মারে কে?

বুড়ো মাঝি একটু হাসল। তারপর, উত্তাল ঝড়ের মধ্যে বিশাল গাঙে তার ছোট ডিঙিটা নিয়ে কোথায় চলে গেল কে জানে?

গুপ্তধন

ভূতনাথবাবু অনেক ধার-দেনা করে, কষ্টে জমানো যা-কিছু টাকা-পয়সা ছিল সব দিয়ে যে পুরোনো বাড়িখানা কিনলেন তা তার বাড়ির কারোর পছন্দ হল না। পছন্দ হওয়ার মতো বাড়িও নয়, তিন-চারখানা ঘর আছে বটে কিন্তু সেগুলোর অবস্থা খুবই খারাপ। দেয়ালে শ্যাওলা, অশ্বত্থের চারা জন্মেছে। দেয়ালের চাপড়া বেশির ভাগই খসে পড়েছে, ছাদে বিস্তর ফুটো-টুটো। মেঝের অবস্থাও ভালো নয়, অজস্র ফাটল। ভূতনাথবাবুর গিন্নি নাক সিঁটকে বলেই ফেললেন, 'এ তো মানুষের বাসযোগ্য নয়।' ভূতনাথবাবুর দুই ছেলে আর তিন মেয়েরও মুখ বেশ ভার-ভার। ভূতনাথবাবু সবই বুঝলেন। দুঃখ করে বললেন, 'আমার সামান্য মাস্টারির চাকরি থেকে যা আয় হয়

তাতে তো এটাই আমার তাজমহল। তাও গঙ্গারামবাবুর ছেলেকে প্রাইভেট পড়াই বলে তিনি দাম একটু কম করেই নিলেন। পঁয়ত্রিশ হাজার টাকায় এ বাজারে কি বাড়ি কেনা যায়! তবে তোমরা যতটা খারাপ ভাবছ ততটা হয়তো নয়। এ বাড়িতে বহুদিন ধরে কেউ বাস করত না বলে অযত্নে এরকম দুরবস্থা, টুকটাক মেরামত করে নিলে খারাপ হবে না। শত হলেও নিজেদের বাড়ি।'

কথাটা ঠিক। এই মহীগঞ্জের মতো ছোট গঞ্জেও বাড়ি ভাড়া বেশ চড়া। ভূতনাথবাবু যে বাড়িতে ছিলেন সে বাড়ির বাড়িওলা নিতাই তাঁকে তুলে দেওয়ার জন্য নানা ফন্দিফিকির করত। মরিয়া হয়েই বাড়ি কেনার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিলেন তিনি।

যাই হোক, বাক্স-প্যাঁটরা নিয়ে, গিন্নি ও পাঁচ ছেলেমেয়ে নিয়ে একদিন ভোরবেলা ভূতনাথবাবু বাড়িটায় ঢুকে পড়লেন। অপছন্দ হলেও বাড়িটা নিজের বলে সকলেরই খুশি-খুশি ভাব। সবাই মিলে বাড়িটা ঝাড়পোঁছ করতে আর ঘর সাজাতে লেগে গেল। ভূতনাথবাবুর ছাত্ররা এসে বাড়ির সামনের বাগানটাও সাফসুতরো করে দিল। কয়েকদিন আগে ভূতনাথবাবু নিজের হাতে গোলা চুন দিয়ে গোটা বাড়িটা চুনকাম করেছেন। তাতেও যে খুব একটা দেখনসই হয়েছে তা নয়, তবে বাড়িতে মানুষ থাকলে ধীরে-ধীরে বাড়ির একটা লক্ষ্মীশ্রীও এসে যায়।

আজ আর রান্নাবান্না হয়নি, সবাই দুধ-চিঁড়ের ফলার খেয়ে ক্লান্ত হয়ে একটু গড়িয়ে নিতে শুয়েছে, এমন সময় একটা লোক এল। বেঁটেখাটো, কালো, রোগাটে, চেহারা, পরনে হেঁটো ধুতি আর গেঞ্জি। গলায় তুলসির মালা। ভূতনাথবাবু বারান্দায় মাদুর পেতে শুতে যাচ্ছিলেন, এমনসময় লোকটা এসে হাতজোড় করে বলল, 'পেন্নাম হই বাবু, বাড়িটা কিনলেন বুঝি?'

'হ্যাঁ, তা আপনি কে?'

'আজ্ঞে আমি হলুম পরাণচন্দ্র দাস। চকবেড়ে থেকে আসছি। চকবেড়ের কাছেই গোবিন্দপুরে নিবাস।'

'অ। তা কাকে খুঁজছেন?'

'আমাকে আপনি-আজ্ঞে করবেন না। নিতান্তই তুচ্ছ লোক। আপনি বিদ্বান মানুষ। পুরোনো বাড়ি খোঁজা আমার খুব নেশা।'

'তাই নাকি?'

'আজ্ঞে, তা বাবু কিছু পেলেনটেলেন? সোনাদানা বা হীরে-জহরত কিছু?'

ভূতনাথবাবু হেসে ফেললেন, 'তাই বলো! এইজন্য পুরোনো বাড়ি খুঁজে বেড়াও? না হে বাপু, আমার কপাল অত সরেস নয়, ধুলোবালি ছাড়া আর কিছু বেরোয়নি।

'ভালো করে খুঁজলে বেরোতেও পারে। মেঝেগুলো একটু ঠুকে-ঠুকে দেখবেন কোথাও ফাঁপা বলে মনে হয় কিনা।'

বাড়িতে গুপ্তধন থাকলে গঙ্গারামবাবু কি আর টের পেতেন না? তিনি ঝানু বিষয়ী লোক।

পরাণ তবু হাল না ছেড়ে বলল, 'তবু একটু খুঁজে দেখবেন। কিছু বলা যায় না। এ তো মনে হচ্ছে একশো বছরের পুরোনো বাড়ি।

'তা হতে পারে।'

'আর একটা কথা বাবু তেনারা আছেন কিনা বলতে পারেন?'

'কে? কাদের কথা বলছ?'

'ওই ইয়ে আর কী—ওই যে রাম নাম করলে যারা পালায়।'

ভূতনাথবাবু ফের হেসে ফেললেন, 'না হে বাপু, ভূতপ্রেতের সাক্ষাৎ এখনও পাইনি। আমার নাম ভূতনাথ হলেও ভূতপ্রেত আমি মানি না।'

'না বাবু অমন কথা কবেন না, পুরোনো বাড়িতেই তেনাদের আস্তানা কিনা। আপনি আসাতে তাঁরা কুপিত হলেই মুশকিল।'

'তা আর কী করা যাবে বলো! থাকলে তাঁরাও থাকবেন, আমিও থাকব।'

'একটু বসব বাবু? অনেক দূর থেকে হেঁটে আসছি।'

ভূতনাথবাবু তাড়াতাড়ি বললেন, 'বোসো-বোসো। দাওয়া পরিষ্কারই আছে।'

লোকটা সসঙ্কোচে বারান্দার ধারে বসে বলল, 'তা বাবু বাড়িটা কতয় কিনলেন?'

'তা বাপু অনেক টাকাই লেগে গেল। পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা। ধারকর্জও হয়ে গেল মেলা।'

'উরিব্বাস! সে তো অনেক টাকা।'

'গরিবের কাছে অনেকই বটে, ধার শোধ করতে জিভ বেরিয়ে যাবে। তা তুমি বরং বোসো, আমি একটু গড়িয়ে নিই। বড্ড ধকল গেছে।'

'আচ্ছা বাবু, আমি একটু বসে থাকি।'

ভূতনাথবাবু একটু চোখ বুজতেই ঘুম চলে এল। যখন চটকা ভাঙল তখন সন্ধে হয়-হয়। অবাক হয়ে দেখলেন, পরাণ দাসও বারান্দার কোণে শুয়ে দিব্যি ঘুমোচ্ছে।

ভূতনাথবাবুর একটু মায়া হল। লোকটাকে ডেকে তুলে বললেন, 'তা পরাণ, তুমি এখন কোথায় যাবে?'

পরাণ একটা হাই তুলে বলল, 'তাই ভাবছি।'

'ভাবছ মানে! তোমার বাড়ি নেই?'

'আছে, তবে সেখানে তো কেউ নেই। তাই বাড়ি যেতে ইচ্ছে যায় না। যা বললুম তা একটু খেয়াল রাখবেন বাবু। পুরোনো বাড়ি অনেক সময় ভারি পয়মন্ত হয়।'

লোকটা উঠতে যাচ্ছিল। ভূতনাথবাবু বাধা দিয়ে বললেন, 'আহা, এই সন্ধেবেলা রওনা হলে বাড়ি যেতে তো তোমার রাত পুইয়ে যাবে বাপু। আজ নতুন বাড়িতে

ঢুকলুম, তুমিও অতিথি। থেকেও যেতে পারো। তিন-চারখানা ঘর আছে। বস্তা-টস্তা পেতে শুতে পারবে না?'

পরাণ দাস আর দ্বিরুক্তি করল না, রয়ে গেল। সরল-সোজা গাঁয়ের লোক দেখে ভূতনাথবাবুর গিন্নি বেশি আপত্তি করলেন না। শুধু বললেন, 'চোরটোর নয় তো!'

ভূতনাথবাবু ম্লান হেসে বললেন, 'হলেই বা আমাদের চিন্তার কী? আমাদের তো দীনদরিদ্র অবস্থা, চোরের নেওয়ার মতো জিনিস বা টাকা-পয়সা কোথা?'

পরাণ দাস কাজের লোক। কুয়ো থেকে জল তুলল, বাচ্চাদের সঙ্গে খেলল, রাতে মশলা পিষে দিল। তারপর একখানা খেঁটে লাঠি নিয়ে সারা বাড়ির মেঝেতে ঠুক-ঠুক করে ঠুকে ফাঁপা আছে কিনা দেখতে লাগল। কাণ্ড দেখে ভূতনাথবাবুর মায়াই হল। পাগল আর কাকে বলে!

খেয়েদেয়ে সবাই ঘুমোলো। শুধু পরাণ দাস বলল, 'আমি একটু চারদিক ঘুরেটুরে দেখি। রাতের বেলাতেই সব অশৈলী কাণ্ড ঘটে কিনা।'

মাঝরাতে নাড়া খেয়ে ভূতনাথবাবু উঠে বসলেন, 'কে?'

সামনে হ্যারিকেন হাতে পরাণ দাস। চাপা গলায় বলল, 'পেয়েছি বাবু।'

অবাক হয়ে ভূতনাথবাবু বললেন, 'কী পেয়েছ?'

'যা খুঁজতে আসা। তবে বুড়োকর্তা দেখিয়ে না দিলে ও জায়গা খুঁজে বের করার সাধ্যি আমার ছিল না।'

ভূতনাথবাবুর মাথা ঘুমে ভোম্বল হয়ে আছে। তাই আরও অবাক হয়ে বললেন, 'বুড়োকর্তাটা আবার কে?'

'একশো বছর আগে এ বাড়িটা তো তাঁরই ছিল কিনা। বড্ড ভালো মানুষ। সাদা ধবধবে দাড়ি, সাদা চুল, হেঁটো ধুতি পরা, আদুর গা, রং যেন দুধে-আলতা। খুঁজে-খুঁজে যখন হয়রান হচ্ছি তখনই যেন দেয়াল ফুঁড়ে বেরিয়ে এলেন।'

একটা হাই তুলে ভূতনাথবাবু বললেন, 'তুমি নিজে তো পাগল বটেই এবার আমাকেও পাগল বানিয়ে ছাড়বে দেখছি। যাও গিয়ে শুয়ে একটু ঘুমোও বাপু।'

'বিশ্বাস হল না তো বাবু। আসুন তাহলে, নিজের চোখেই দেখবেন।'

বিরক্ত হলেও ভূতনাথবাবুর একটু কৌতুহলও হল।

পরাণ দাসের পিছু-পিছু বাড়ির পিছন দিকে রান্নাঘরের পাশের এঁদো ঘরখানায় ঢুকে থমকে গেলেন। মেঝের ওপর স্তুপাকার ইট, মাটি ছড়িয়ে আছে, তার মাঝখানে একটা গর্ত।

'এসব কী করেছ হে পরাণ? মেঝেটা যে ভেঙে ফেলেছ।'

'যে আজ্ঞে, এবার গর্তে একটু উঁকি মেরে দেখুন।'

হ্যারিকেনের ম্লান আলোয় ভূতনাথবাবু গর্তের মধ্যে উঁকি মেরে দেখলেন একটা কালোমতো কলসি জাতীয় কিছু।

'আসুন বাবু, নেমে পড়ুন। বড্ড ভারী। দুজনা না হলে টেনে তোলা যাবে না।'

ভূতনাথবাবুর হাত-পা কাঁপতে লাগল উত্তেজনায়।

বললেন, 'কী আছে ওতে?'

'তুললেই দেখতে পাবেন। আসুন বাবু, একটু হাত লাগান।'

ভূতনাথবাবু নামলেন। তারপর মুখ ঢাকা ভারী কলসিটা দুজনে মিলে অতি কষ্টে তুললেন ওপরে। পরাণ একগাল হেসে বলল, 'এবার খুলে দেখুন বাবু আপনার জিনিস।'

বেশ বড় পিতলের কলসি। মুখটায় একটা ঢাকনা খুব আঁট করে বসানো। শাবলের চাড় দিয়ে ঢাকনা খুলতেই চকচকে সোনার টাকা এই হ্যারিকেনের আলোতেও ঝকমক করে উঠল।

'বলেছিলুম কিনা বাবু! এখন দেখলেন তো, যান আপনার আর কোনও দুঃখ থাকল না। দু-তিন পুরুষ হেসে খেলে চলে যাবে।'

ভূতনাথবাবু নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। এরকমও হয়! পরাণের দিকে চেয়ে বললেন, 'এসব সত্যি তো স্বপ্ন নয় তো!'

'না বাবু, স্বপ্ন নয়। বুড়ো কর্তার সবকিছু এর মধ্যে। এত দিনে গতি হল।'

ভূতনাথবাবু পরাণকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'পাগল হলেও তুমি খুব ভালো লোক। এর অর্ধেক তোমার।'

পরাণ সভয়ে পিছিয়ে গিয়ে বলল, 'ওরে বাবা, ও কথা শুনলেও পাপ। টাকা-পয়সায় আমার কী হবে বাবু?'

'তার মানে? এত মোহর পেয়েও নেবে না?'

'না বাবু, আমার আছেটা কে যে ভোগ করবে? একা বোকা মানুষ, ঘুরে-ঘুরে বেড়াই, বেশ আছি। টাকা-পয়সা হলেই বাঁধা পড়ে যেতে হবে।'

ভূতনাথবাবু চোখ কপালে তুলে বললেন, 'তাহলে গুপ্তধন খুঁজে বেড়াও কেন?'

'আজ্ঞে, ওইটেই আমার নেশা। খুঁজে বেড়ানোতেই আনন্দ। লুকোচুরি খেলতে যেমন আনন্দ হয় এও তেমনি। আচ্ছা আসি বাবু। ভোর হয়ে আসছে, অনেকটা পথ যেতে হবে।'

পরাণ দাস চলে যাওয়ার পর ভূতনাথবাবু অনেকক্ষণ বজ্রাহতের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর ভাবলেন, একটা সামান্য লোকের কাছে হেরে যাব? ভেবে কলসিটা আবার গর্তে নামিয়ে মাটি চাপা দিলেন। ওপরে ইটগুলো খানিক সাজিয়ে রাখলেন। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে একটু হাসলেন।

শিবেনবাবু ভালো আছেন তো

হরসুন্দরবাবু একটু নাদুসনুদুস, ধীর-স্থির-শান্ত প্রকৃতির মানুষ। তিনি কোঁচা দুলিয়ে ধুতি পরেন, ফুলহাতা জামার গলা অবধি বোতাম আঁটেন, কখনও হাতা গোটান না। শীত-গ্রীষ্ম সবসময়ে তিনি হাঁটু অবধি মোজা আর পাম্পশু পরেন। তাঁর বেশ মোটা এক জোড়া গোঁফ আছে। চুলে পরিপাটি সিঁথি। হরসুন্দরবাবু খুব নিরীহ মানুষও বটে।

সেদিন মাসের পয়লা তারিখ। হরসুন্দরবাবু সেদিন বেতন পেয়েছেন। সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরছেন। যে গলিটায় তিনি থাকেন সেটা বেশ অন্ধকার, পাড়াটাও ভালো নয়। হরসুন্দরবাবু গলিতে ঢুকে কয়েক পা এগোতেই তিনটে ছোকরা তাঁকে ঘিরে ফেলল। একজন বুকে রিভলভার ঠেকাল, একজন পেটে আর অন্যজন পিঠে দুটো ছোরা ধরল। রিভলভারওলা বলল, 'চেঁচাবেন না। যা আছে দিয়ে দিন।'

হরসুন্দরবাবু খুবই ভয় পেলেন। ভয়ে তাঁর গলা কাঁপতে লাগল। বললেন, 'প্রাণে মেরো না ভাই। দিচ্ছি।'

মাইনের পুরো টাকাটা নিয়ে তিনজন হাপিস হয়ে গেল। হরসুন্দরবাবু ভয়ে চেঁচামেচি করলেন না যদি তারা ফিরে আসে! বাড়িতে ফিরেও কারও কাছে ঘটনাটা প্রকাশ করলেন না। ভাবলেন এ মাসটা ধারকর্জ করে চালিয়ে নিলেই হবে।

তা নিলেনও হরসুন্দরবাবু। একটা মাস দেখতে-দেখতে চলে গেল। আবার পয়লা তারিখ এল। হরসুন্দরবাবু অবার বেতন পেলেন।

ফেরার সময় যখন গলির মধ্যে ঢুকলেন তখন আচমকা ফের তিনটে লোক ঘিরে ধরল। বুকে রিভলভার, পেটে পিঠে ছোরা।

রিভালভারওলা বলল,' যা আছে দিয়ে দিন। চেঁচাবেন না।'

হরসুন্দরবাবু ফের ভয়ে কাঁপতে-কাঁপতে বললেন, 'প্রাণে মেরো না ভাই। দিচ্ছি।'

মাইনের টাকা নিয়ে লোক তিনটে হাপিস হয়ে গেল।

হরসুন্দরবাবু এবারও বাড়ি ফিরে কাউকে কিছু বললেন না। ভাবলেন, এ মাসটাও কোনওরকমে চালিয়ে নেবেন।

কষ্ট হলো যদিও, কিন্তু হরসুন্দরবাবু চালিয়ে নিলেন। ফের পয়লা তারিখ এল। হরসুন্দরবাবু বেতন পেলেন।

বাড়ি ফেরার সময় অন্ধকার গলিতে ঠিক আগের মতোই তিনটে লোক ঘিরে ধরল তাকে। বুকে-পিঠে-পেটে ঠিক একই জায়গায় রিভালভার আর ছোরা ধরল। একই কথা বলল, এবং বেতনের টাকাটা নিয়ে হাওয়া হল।

হরসুন্দরবাবুর আজ চোখে জল এল।

বাড়ি ফিরে তিনি গুম হয়ে রইলেন। রাতে ভালো করে খেলেন না। গভীর রাতে তিনি ছাদে উঠে চুপ করে আকাশের দিকের চেয়ে অসহায়ভাবে ভাবলেন, কী যে করব বুঝতে পারছি না।

কাছেপিঠে কে যেন একটা হাই তুলল, তারপর আঙুল মটাকানোর শব্দ হল, তারপর বলল, 'হবি, হবি।' হরসুন্দরবাবু চারদিকটা চেয়ে দেখলেন। ছাদ জনশূন্য, শীতকালের গভীর রাত্রে ছাদে আসবেই বা কে?

তিনি কাঁপা গলায় জিগ্যেস করলেন, 'আপনি কে?'

'ভেবে দেখতে হবে হে, ভেবে দেখতে হবে।'

'তার মানে?'

'কতবার জন্মেছি তার কি হিসেব আছে? কোন জন্মে কে ছিলুম তা যে গুবলেট হয়ে যায় বাপ। এ জন্মে বিশু তো ও জন্মে নিতাই, পরের জন্মে হয়তো চিনেম্যান চাঁই চুঁই।'

'আ-আপনি কোথায়? দে দেখেতে পাচ্ছি না তো!'

গলার স্বরটা খিঁচিয়ে উঠে বলল, 'দেখার চোখ আছে কি তোমার যে দেখবে? সারাদিনই তো তোমার ধারেকাছে ঘুরঘুর করি, দেখতে চেয়েছ কি কখনও?'

'আজ্ঞে, আমি যে কিছু বুঝতে পারছি না, ভয় পাচ্ছি, মাথা ঝিমঝিম করছে।'

'আ মোলো! এ যে ভালো করতে এসে বিপদ হল।'

'আ-আপনি কী চান?'

'তোমার মতো গবেটদের কান দুটো মলে দিতেই চাই হে। কিন্তু বিধি বাম সে উপায় নেই।'

'আমি কী করেছি? আপনি আমার ওপর রাগ করছেন কেন?'

'রাগ করব না? তিনটে কাঁচা মাথার ছোঁড়া তিন-তিনবার যে তোমাকে বোকা বানাল তা থেকে শিক্ষা পেয়েছ কি? কিছু করতে পারলে?'

'আজ্ঞে কী করব? তাদের হাতে যে ছোরা আর বন্দুক।'

'আর তোমার বুঝি কিছু নেই?'

'আজ্ঞে না।'

'কে বলল, নেই?'

'ইয়ে, আমার বন্দুক, পিস্তল বা ছোরাছুরি নেই। তবে আমার গিন্নির একখানা বঁটি আছে, আর আমার ছেলে ভুতোর একটা পেন্সিল কাটা ছুরি আছে, আর আমার মায়ের বেড়াল তাড়ানোর জন্য একখানা ছোট লাঠি আছে।'

'আহা, ওসব জানতে চাইছে কে? বঁটি-লাঠির কথা জিগ্যেস করেছি কি তোমায়? বলি এসব ছাড়া তোমার আর কিছু নেই?'

'আজ্ঞে, মনে পড়ছে না। শুনেছি আমার ঠাকুর্দার একটা গাদা বন্ধুক ছিল।'

'গবেট আর কাকে বলে? বলি বন্দুক-টন্দুক ছাড়া আর কিছু নেই তোমার?'

'আজ্ঞে না।'

'বলি, বুদ্ধি বলে একটা বস্তু আছে জানো তো!'

'জানি।'

'তোমার সেটাও নেই?'

আজ্ঞে, ঠিক বুঝতে পারছি না।

একটা দীর্ঘশ্বাসের আওয়াজ হল। তারপর গলার স্বরটা বলল, 'শোনো, এবার যখন ওই মর্কটগুলো তোমাকে পাকড়াও করবে তখন একটুও ঘাবড়াবে না। হাসি-হাসি মুখ করে শুধু জিগ্যেস করবে, আচ্ছা, শিবেনবাবু ভালো আছেন তো!'

'শুধু এই কথা বললেই হবে?'

'বলেই দেখো না।'

তৃতীয় মাসটাও কষ্টেসৃষ্টে কেটে গেল। আবার পয়লা তারিখ এল এবং হরসুন্দরবাবু আবার বেতন পেলেন।

বাড়ি ফেরার সময় বুকটা দুরুদুরু করছিল। যে-কথাটা বলতে হবে তা বারবার

বিড়বিড় করে আওড়াচ্ছেন। হাত-পা-কাঁপছে, গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। গলির মুখে একটু থমকে দাঁড়ালেন। তারপর দুর্গা বলে অন্ধকারে পা বাড়ালেন।

কয়েক পা যেতে না যেতেই তিন মূর্তি ঘিরে ফেলল তাঁকে। বুকে পিস্তল, পেটে আর পিঠে ছোরা।

পিস্তলওলা বলল, 'চেঁচাবেন না। যা আছে দিয়ে দিন।'

জীবনে কোনও সাহসের কাজ করেননি হরসুন্দরবাবু। আজই প্রথম করলেন। জোর করে মুখে একটু হাসি ফুটিয়ে তিনি জিগ্যেস করলেন, 'আচ্ছা, শিবেনবাবু ভালো আছেন তো?'

ছেলে তিনটে হঠাৎ যেন থমকে গেল। আর তার পরেই দুড়দাড় দৌড়ে এমনভাবে পালাল যেন ভূত দেখেছে।

হরসুন্দরবাবু খুবই অবাক হয়ে গেলেন। এই সামান্য কথায় এত ভয় পাওয়ার কী আছে? যাক গে, এবার মাইনের টাকাটা তো বেঁচে গেল!

না, এর পর থেকে হরসুন্দরবাবুকে আর ওদের পাল্লায় পড়তে হয়নি বটে, কিন্তু তাঁর ধাঁধাটা গেল না। এই তো সেদিন তাঁর অফিসের বড়বাবু তাঁকে কাজের একটা ভুলের জন্য খুব বকাঝকা করে চার্জশিট দেন আর কী। হরসুন্দরবাবু শুধু হাসি-হাসি মুখ করে তাঁকে বলেছিলেন, 'আচ্ছা, শিবেনবাবু ভালো আছেন তো!' তাইতে বড়বাবু এমন ঘাবড়ে গেলেন, যে আর বলার নয়। তারপর থেকে খুবই ভালো ব্যবহার করে যাচ্ছেন।

সেদিন বাজার থেকে পচা মাছ এনেছিলেন বলে হরসুন্দরের গিন্নি তাঁকে খুবই তুলোধোনা করছিলেন। হরসুন্দরবাবু তাঁকেও বললেন, 'আচ্ছা, শিবেনবাবু ভালো আছেন তো। গিন্নি একেবারে জল।'

'হ্যাঁ, এখন হরসুন্দরবাবু খুবই ভালো আছেন। কোনও উদ্বেগ, অশান্তি নেই, বিপদ দেখা দিলেই তিনি শুধু বলেন, আচ্ছা, শিবেনবাবু ভালো আছেন তো! মন্ত্রের মতো কাজ হয়।

কৌটোর ভূত

জয়তিলকবাবু যখনই আমাদের গাঁয়ের বাড়িতে আসতেন, তখনই আমরা অর্থাৎ ছোটরা ভারী খুশিয়াল হয়ে উঠতুম।

তখনকার অর্থাৎ প্রায় ত্রিশ বছর আগের পূর্ববঙ্গের গাঁ-গঞ্জ ছিল আলাদা রকম, মাঠ-ঘাট, খাল-বিল, বন-জঙ্গল মিলে এক আদিম আরণ্যক পৃথিবী। সাপ-খোপ, জন্তু-জানোয়ার তো ছিলই, ভূত-প্রেতেরও অভাব ছিল না। আর ছিল নির্জনতা।

তবে আমাদের বিশাল যৌথ পরিবারে মেলা লোকজন, মেলা কাচ্চাবাচ্চা। মেয়ের সংখ্যাই অবশ্য বেশি। কারণ বাড়ির পুরুষেরা বেশির ভাগই শহরে চাকরি করত, আসত কালেভদ্রে। বাড়ি সামাল দিত দাদু-টাদু গোছের বয়স্করা। বাবা-কাকা-দাদাদের সঙ্গে বলতে কী আমাদের ভালো পরিচয়ই ছিল না, তাঁরা প্রবাসে থাকার দরুন।

বাচ্চারা মিলে আমরা বেশ হই-হুল্লোড়বাজিতে সময় কাটিয়ে দিতাম! তখন পড়াশুনোর চাপ ছিল না। ভয়াবহ কোনও শাসন ছিল না। যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল। কিন্তু অভাব ছিল একটা জিনিসের। আমাদের কেউ যথেষ্ট পাত্তা বা মূল্য দিত না।

জয়তিলকবাবু দিতেন। আত্মীয় নন, মাঝেমধ্যে এসে হাজির হতেন। কয়েক দিন থেকে আবার কোথায় যেন উধাও হতেন। কিন্তু যে-কয়েকটা দিন থাকতেন, বাচ্চাদের গল্পে আর নানারকম মজার খেলায় মাতিয়ে রাখতেন।

মাথায় টাক, গায়ের রঙ কালো, বেঁটে, আঁটো গড়ন আর পাকা গোঁফ ছিল তাঁর। ধুতি আর ফতুয়া ছিল বারোমেসে পোশাক, শীতে একটা মোটা চাদর। সর্বদাই একটা বড় বোঁচকা থাকত সঙ্গে। শুনতাম, তাঁর ফলাও কারবার। তিনি নাকি সব কিছু কেনেন এবং বেচেন। যা পান তাই কেনেন, যাকে পান তাকেই বেচেন। কোনও বাছাবাছি নেই।

সেবার মাঘ মাসের এক সকালে আমাদের বাড়ি এসে হাজির হলেন। হয়েই দাদুকে বললেন, 'গাঙ্গুলিমশাই, এবার কিছু ভূত কিনে ফেললাম।'

দাদু কানে কম শুনতেন, মাথা নেড়ে বললেন, 'খুব ভালো। এবার বেচে দাও।'

জয়তিলক কাঁচুমাচু মুখ করে বললেন, 'সেটাই তো সমস্যা! ভূত কেনে কে? খদ্দের দিন না।'

'খদ্দর? না বাপু ওসব আমি পরি না। স্বদেশীদের কাছে যাও।'

'আহা, খদ্দর নয়, খদ্দের, মানে গাহেক।'

'গায়ক! না বাপু, গান-বাজনা আমার আসে না।'

জয়তিলক অগত্যা ক্ষান্ত দিয়ে আমাদের সঙ্গে এসে জুটলেন। তিনি ভূত কিনেছেন শুনে আমাদের চোখ গোল্লা-গোল্লা। ঘিরে ধরে ভূত দেখাও ভূত দেখাও বলে মহা সোরগোল তুলে ফেললুম।

প্রথমে কিছুতেই দেখাতে চান না। শেষে আমরা ঝুলোঝুলি করে তাঁর গোঁফ আর জামা ছিঁড়ে ফেলার উপক্রম করায় বললেন, 'আচ্ছা, আচ্ছা, দেখাচ্ছি। কিন্তু সব ঘুমন্ত ভূত, শুকিয়ে রাখা।'

'সে আবার কী?'

'আহা, যেমন মাছ শুকিয়ে শুঁটকি হয় বা আম শুকিয়ে আমসি হয় তেমনই আর কী, বহু পুরোনো জিনিস।'

জয়তিলক তাঁর বোঁচকা খুলে একটা জং-ধরা টিনের কৌটো বার করলেন। তারপর খুব সাবধানে ভেতরে উঁকি মেরে দেখে নিয়ে ফিসফিস করে বললেন, 'বেশি গোলমাল কোরো না, এক-এক করে উঁকি মেরে দেখে নাও। ভূতেরা জেগে গেলেই মুশকিল।'

'কী দেখলুম, তা বলা একটা সমস্যা। মনে হল, শুকনো পলতা পাতার মতো চার-পাঁচটা কেলেকুষ্টি জিনিস কৌটোর নিচে পড়ে আছে। কৌটোর ভিতরটা অন্ধকার বলে ভালো বোঝাও গেল না। জয়তিলক টপ করে কৌটোর মুখ এঁটে দিয়ে বললেন, 'আর না। এসব বিপজ্জনক জিনিস।'

বলাবাহুল্য ভূত দেখে আমরা আদপেই খুশি হইনি। আমরা সিদ্ধান্ত নিলুম যে, ওগুলো মোটেই ভূত নয়। জয়তিলকবাবুকে ভালোমানুষ পেয়ে কেউ ঠকিয়েছে।'

জয়তিলকবাবু মাথা নেড়ে বললেন, 'না হে ঠকায়নি। চৌধুরি বাড়ির বহু পুরোনো লোক হল গোলোক। সারা জীবন কেবল ভূত নিয়ে কারবার। তার তখন শেষ অবস্থা, মুখে জল দেওয়ার লোক নেই। সেই সময়টায় আমি গিয়ে পড়লাম। সেবাটেবা করলাম খানিক, কিন্তু তার তখন ডাক এসেছে। মরার আগে আমাকে কৌটোটা দিয়ে বলল, তোমাকে কিছু দিই এমন সাধ্য নেই। তবে কয়েকটা পুরোনো ভূত শুকিয়ে রেখেছি। এগুলো নিয়ে যাও, কাজ হতে পারে। ভূতগুলোর দাম হিসেব করলে অনেক। তা তোমার কাছ থেকে দাম নেবই বা কী করে, আর নিয়ে হবেই বা কী। তুমি বরং আমাকে পাঁচ টাকার রসগোল্লা খাওয়াও। শেষ খাওয়া আমার।

এই বলে জয়তিলকবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন।

আমরা তবু বিশ্বাস করছিলুম না দেখে জয়তিলকবাবু বললেন, 'মরার সময় মানুষ বড় একটা মিছে কথা বলে না।'

তবু আমাদের বিশ্বাস হল না। কিন্তু সেকথা আর বললুম না তাঁকে।

দুপুরবেলা যখন জয়তিলকবাবু খেয়েদেয়ে ভুঁড়ি ভাসিয়ে ঘুমোচ্ছেন, ঠিক সেই সময়ে আমি অর বিশু তাঁর ভূতের কৌটো চুরি করলুম। একদৌড়ে আমবাগানে পৌঁছে কৌটো খুলে ফেললুম। উপুড় করতেই পাঁচটা শুকনো পাতার মত জিনিস পড়ল মাটিতে। হাতে নিয়ে দেখলুম, খুব হালকা, এত হালকা যে জিনিসগুলো আছে কি নেই বোঝা যায় না। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে মনে হল, এগুলো পাতাটাতা নয়। অনেকটা ঝুল জাতীয় জিনিস, তবে পাক খাওয়ানো, বেশ ঠান্ডাও।

বিশু বলল, 'ভূত কিনা তা প্রমাণ হবে, যদি ওগুলো জেগে ওঠে।'

'তা জাগাবি কী করে?'

'আগুনে দিলেই জাগবে। ছ্যাঁকার মতো জিনিস নেই।'

আমরা শুকনো পাতা আর ডাল জোগাড় করে কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুন জ্বেলে ফেললুম। আঁচ উঠতেই প্রথমে একটা ভূতকে আগুনের মধ্যে ফেলে দিলুম।

প্রথমে একটা উৎকট গন্ধ উঠল। তারপর আগুনটা হঠাৎ হাত দেড়েক লাফিয়ে উঠল। একটু কালো ধোঁয়া বেরিয়ে এল। তারপরই হড়াস করে অন্তত সাড়ে পাঁচ ফুট উঁচু একটা কেলে চেহারার বিকট ভূত আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। চোখ দুখানা কটমট করছে।

'ওরে বাবা রে!' বলে আমরা দৌড়তে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলুম। পড়ে গিয়ে দেখলুম, জ্যান্ত ভূতটা আর-চারটে ঘুমন্ত ভূতকে তুলে আগুনে ফেলে দিচ্ছে।

চোখের পলকে পাঁচটা ভূত বেরিয়ে এল। তারপর হাসতে-হাসতে আমবাগানের ভেতর দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

ঘটনাটির কথা আমরা কাউকেই বলিনি। জয়তিলকবাবুর শূন্য কৌটোটা যথাস্থানে রেখে দিয়ে এলুম।

সেই রাত্রি থেকে আমাদের বাড়িতে প্রবল ভূতের উপদ্রব শুরু হয়ে গেল।

রান্নাঘরে ভূত, গোয়ালে ভূত, কুয়োপাড়ে ভূত। এই তারা হিঁ হিঁ করে হাসে, এই তারা মাছ চুরি করে খায়। এই ঝি-চাকরদের ভয় দেখায়। সে কী ভীষণ উপদ্রব! ভূতের দাপটে সকলে তটস্থ।

জয়তিলকবাবু এইসব কাণ্ড দেখে নিজের কৌটো খুলে মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। বললেন, 'এঃ হেঃ, ভূতগুলো পালিয়েছে তাহলে! ইস, কী দারুণ জাতের ভূত ছিল, বেচলে মেলা টাকা পাওয়া যেত। নাঃ ভূতগুলোকে ধরতেই হয় দেখছি।

এই বলে জয়তিলকবাবু মাছের জাল নিয়ে বেরোলেন। ভূত দেখলেই জাল ছুঁড়ে মারেন। কিন্তু জালে ভূত আটকায় না। জয়তিলকবাবু আঠাকাঠি দিয়ে চেষ্টা করে দেখলেন। কিন্তু ভূতের গায়ে আঠাও ধরে না। এরপর জাপটে ধরার চেষ্টাও যে না করেছেন, তাও নয়। কিন্তু কিছুতেই ভূতদের ধরা গেল না।

দুঃখিত জয়তিলকবাবু কপাল চাপড়ে আবার শুঁটকি ভূতের খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন।

পাঁচ-পাঁচটা ভূত দাপটে আমাদের বাড়িতে রাজত্ব করতে লাগল।